মরণের ডঙ্কা বাজে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

1.চাঁদপাল ঘাট 3
2.এরা ডাকাত নয় 28
3.এগারো ঘণ্টা ডিউটি...50
4.ধুলো কাদা মাখা চেহারা 70

1.চাঁদপাল ঘাট

চাঁদপাল ঘাট থেকে রেঙ্গুনগামী মেল স্টিমার ছাড়ছে। বহু লোকজনের ভিড়। পুজোর ছুটির ঠিক পরেই। বর্মা প্রবাসী দু-চারজন বাঙালি পরিবার রেঙ্গুনে ফিরচে। কুলিরা মালপত্র তুলচে। দড়াদড়ি ছোঁড়াছুড়ি, হইহই। ডেকযাত্রীদের গোলমালের মধ্যে জাহাজ ছেড়ে গেল। যারা আত্মীয়স্বজনকে তুলে দিতে এসেছিল, তারা তীরে দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়তে লাগল।

সুরেশ্বরকে কেউ তুলে দিতে আসেনি। কারণ কলকাতায় তার জানাশোনা বিশেষ কেউ নেই! সবে চাকরিটা পেয়েছে, একটা বড়ো ঔষধ-ব্যবসায়ী ফার্মের ক্যানভাসার হয়ে সে যাচ্ছে রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুর।

সুরেশ্বরের বাড়ি হুগলি জেলার একটা গ্রামে। বেজায় ম্যালেরিয়ায় দেশটা উচ্ছন্ন গিয়েছে, গ্রামের মধ্যে অত্যন্ত বনজঙ্গল, পোড়ো বাড়ির ইট পাকার হয়ে পথে যাতায়াত বন্ধ করেছে, সন্ধ্যার পর সুরেশ্বরদের পাড়ায় আলো জ্বলে না।

ওদের পাড়ায় চারিদিকে বনজঙ্গল ও ভাঙা পোডড়াবাড়ির মধ্যে একমাত্র অধিবাসী সুরেশ্বররা। কোনো উপায় নেই বলেই এখানে পড়ে থাকা–নইলে কোন কালে উঠে গিয়ে শহর-বাজারের দিকে বাস করত ওরা।

সুরেশ্বর বি. এস-সি. পাস করে এতদিন বাড়িতে বসে ছিল। চাকরি মেলা দুর্ঘট আর কে-ই বা করে দেবে–এই সবের জন্যেই সে চেষ্টা পর্যন্ত করেনি। তার বাবা সম্প্রতি পেনসন নিয়ে বাড়ি এসে বসেছেন, খুব সামান্যই পেনসন–সে আয়ে সংসার চালানো কায়ক্লেশে হয়; কিন্তু তাও পাড়াগাঁয়ে। শহরে সে আয়ে চলে না। বছর খানেক বাড়ি বসে থাকবার পরে সুরেশ্বর গ্রামে আর থাকতে পারলে না। গ্রামে নেই লোকজন। তার সমবয়সি এমন কোনো ভদ্রলোকের ছেলে নেই যার সঙ্গে দু-দন্ড কথাবার্তা বলা যায়। সন্ধ্যা আটটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়াই গ্রামের নিয়ম। তারপর কোনোদিকে সাড়াশব্দ নেই।

ক্রমশ এ জীবন সুরেশ্বরের অসহ্য হয়ে উঠল। সে ঠিক করলে কলকাতায় এসে টিউশনি করেও যদি চালায়, তবুও তো শহরে থাকতে পারবে এখন।

আজ মাস পাঁচ-ছয় আগে সুরেশ্বর কলকাতায় আসে এবং দেশের একজন পরিচিত লোকের মেসে ওঠে। এতদিন এক-আধটা টিউশনি করেই চালাচ্ছিল, সম্প্রতি এই চাকরিটা পেয়েছে, তারই এক ছাত্রের পিতার সাহায্যে ও সুপারিশে। সঙ্গে তিন বাক্স

ঔষধ-পত্রের নমুনা আছে বলে তাদের ফার্মের মোটরগাড়ি ওকে চাঁদপাল ঘাটে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল।

এই প্রথম চাকরি এবং এই প্রথম দূর বিদেশে যাওয়া–সুরেশ্বরের মনে খানিকটা আনন্দ ও খানিকটা বিষাদ মেশানো এক অদ্ভুত ভাব। একদল মানুষ আছে, যারা অজানা দূর বিদেশে নতুন নতুন বিপদের সামনে পড়বার সুযোগ পেলে নেচে ওঠে–সুরেশ্বর ঠিক সে দলের নয়। সে নিতান্তই ঘরকুনো ও নিরীহ ধরনের মানুষ–তার মতো লোক নিরাপদে চাকরি করে আর দশজন বাঙালি ভদ্রলোকের মতো নির্বিঘ্নে সংসারধর্ম পালন করতে পারলে সুখী হয়।

তাকে যে বিদেশে যেতে হচ্ছে–তাও যে-সে বিদেশ নয়, সমুদ্র পারের দেশে পাড়ি দিতে হচ্ছে–সে নিতান্তই দায়ে পড়ে। নইলে চাকরি থাকে না! সে চায়নি এবং ভেবেও রেখেছে এইবার নিরাপদে ফিরে আসতে পারলে অন্য চাকরির চেষ্টা করবে।

কিন্তু জাহাজ ছাড়বার পরে সুরেশ্বরের মন্দ লাগছিল না। ধীরে ধীরে বোটানিক্যাল গার্ডেন, দুই তীর-ব্যাপী কলকারখানা পেছনে ফেলে রেখে প্রকান্ড জাহাজখানা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। ভোর ছটায় জাহাজ ছেড়েছিল, এখন বেশ রৌদ্র উঠেছে, ডেকের একদিকে অনেকখানি জায়গায় যাত্রীরা ডেক-চেয়ার পেতে গল্পগুজব জুড়ে দিয়েছে, স্টিমারের একজন কর্মচারী সবাইকে বলে গেল পাইলট নেমে যাওয়ার আগে যদি ডাঙায় কোনো চিঠি পাঠানো দরকার হয় তা যেন লিখে রাখা হয়।

বয় এসে বললে–আপনাকে চায়ের বদলে আর কিছু দেব?

সুরেশ্বর সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী, সে চা খায় না, এখবর আগেই জানিয়েছিল এবং কিছু আগে সকলকে চা দেওয়ার সময়ে চায়ের পেয়ালা সে ফেরত দিয়েছে।

সুরেশ্বর বললে–না, কিছু দরকার নেই।

বয় চলে গেল।

এমন সময় কে একজন বেশ মার্জিত ও ভদ্র সুরে পেছনের দিক থেকে জিজ্ঞেস করলে– মাপ করবেন, মশায় কি বাঙালি।

সুরেশ্বর পেছনে ফিরে বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলে এইমাত্র একজন নব আগন্তুক যাত্রী তার ডেক-চেয়ার পাতবার মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়েছে ও তাকে প্রশ্ন করছে। তার

বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি নয়, একহারা, দীর্ঘ সুঠাম চেহারা। সুন্দর মুখশ্রী, চোখ দুটি বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল–সবসুদ্ধ মিলিয়ে বেশ সুপুরুষ।

সুরেশ্বর উত্তর দেওয়ার আগেই সে লোকটি হাসিমুখে বললে–কিছু মনে করবেন না, একসঙ্গেই ক-দিন থাকতে হবে আপনার সঙ্গে, একটু আলাপ করে নিতে চাই। প্রথমটা বুঝতে পারিনি আপনি বাঙালি কিনা।

সুরেশ্বর হেসে বললে–এর আর মনে করবার কী? ভালোই তো হল আমার পক্ষেও। সেকেণ্ড ক্লাসে আর কি বাঙালি নেই?

না, আর যাঁরা যাচ্ছেন–সবাই ডেকে। একজন কেবল ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী। আপনি কতদূর যাবেন–রেঙ্গুনে?

আপাতত তাই বটে–সেখান থেকে যাব সিঙ্গাপুর।

বেশ, বেশ খুব ভালো হল। আমিও তাই। সরে এসে বসুন এদিকে, আপনার সঙ্গে একটু ভালো করে আলাপ জমিয়ে নিই। বাঁচলুম আপনাকে পেয়ে।

সুরেশ্বর শীঘ্রই তার সঙ্গীটির বিষয়ে তার নিজের মুখেই অনেক কথা শুনলে। ওর নাম বিমলচন্দ্র বসু, সম্প্রতি মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়ে ডাক্তারি করবার চেষ্টায় সিঙ্গাপুর যাচ্ছে। বিমলের বাড়ি কলকাতায়, ওদের অবস্থা বেশ ভালোই। ওদের পাড়ার এক ভদ্রলোকের বন্ধু সিঙ্গাপুরে ব্যাবসা করেন, তাঁর নামে বিমল চিঠি নিয়ে যাচ্ছে।

কথাবার্তা শুনে সুরেশ্বরের মনে হল বিমল অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সাহসী। নতুন দেশে নতুন জীবনের মধ্যে যাবার আনন্দেই সে মশগুল। সে বেশ সবল যুবকও বটে। অবশ্য সুরেশ্বর নিজেও গায়ে ভালোই শক্তি ধরে, এক সময়ে রীতিমতো ব্যায়াম ও কুস্তি করত, তারপর গ্রামে অনেকদিন থাকার সময়ে সে মাটি-কোপানো, কাঠ-কাটা প্রভৃতি সংসারের কাজ নিজের হাতে করত বলে হাত-পা যথেষ্ট শক্ত ও কর্মক্ষম।

ক্রমে বেলা বেশ পড়ে এল। সুরেশ্বর ও বিমল ডেকে বসে নানারকম গল্প করছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে হঠাৎ বিমল বললে–আমি একবার কেবিন থেকে আসি, আপনি বসুন। ডায়মণ্ডহারবার ছাড়িয়েছে, এখুনি পাইলট নেমে যাবে। আমার চিঠিপত্র দিতে হবে ওর সঙ্গে। আপনি যদি চিঠিপত্র দেন তবে এই বেলা লিখে রাখুন।

সাগর-পয়েন্টের বাতিঘর দূর থেকে দেখা যাওয়ার কিছু আগেই কলকাতা বন্দরের পাইলট জাহাজ থেকে নেমে একখানা স্টিমলঞ্চে কলকাতার দিকে চলে গেল।

সাগর-পয়েন্ট ছাড়িয়ে কিছু পরেই সমুদ্র–কোনো দিকে ডাঙা দেখা যায় না–ঈষৎ ঘোলা ও পাটকিলে রঙের জলরাশি চারিধারে। সন্ধ্যা হয়েছে, সাগর-পয়েন্টের বাতিঘরে আলো ঘুরে ঘুরে জ্বলছে, কতকগুলি সাদা গাংচিল জাহাজের বেতারের মাস্তুলের ওপর উড়ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত করছে বলে বিমল কেবিন থেকে ওভার-কোটটা আনতে গেল, সুরেশ্বর ডেকে বসে রইল।

জ্যোৎস্না রাত। ডেকের রেলিং-এর ধারে চাঁদের আলো এসে পড়েছে, সুরেশ্বরের মন এই সন্ধ্যায় খুবই খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ বাড়ির কথা ভেবে, বৃদ্ধ বাপ-মায়ের কথা ভেবে, আসবার সময়ে বোন প্রভার অশ্রুসজল করুণ মুখখানির কথা ভেবে।

পূর্বেই বলেছি সুরেশ্বর নিরীহ প্রকৃতির ঘরোয়া ধরনের লোক। বিদেশে যাচ্ছে তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, চাকরির খাতিরে। বিমল যদিও সুরেশ্বরের মতো ঘরকুনো নয়, তবুও তার সিঙ্গাপুরে যাবার মধ্যে কোনো দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ছিল না। সে চিঠি নিয়ে যাচ্ছে পরিচিত বন্ধুর নিকট থেকে সেখানকার লোকের নামে, তারা ওকে সন্ধান বলে দেবে, পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবে; তারপর বিমল সেখানে একখানা বাড়ি ভাড়া নিয়ে গেটের গায়ে নাম-খোদাই পেতলের পাত বসিয়ে শান্ত ও সুবোধ বালকের মতো ডাক্তারি আরম্ভ করে দেবে–এই ছিল তার মতলব। যেমন পাঁজজনে দেশে বসে করছে, সে না হয় গিয়ে করবে সিঙ্গাপুরে।

কিন্তু দু-জনেই জানত না একটা কথা।

তারা জানত না যে নিরুপদ্রব, শান্তভাবে ডাক্তারি ও ওষুধের ক্যানভাসারি করতে তারা যাচ্ছে না–তাদের অদৃষ্ট তাদের দুজনকে একসঙ্গে গেঁথে নিয়ে চলেছে এক বিপদসংকুল পথযাত্রা এবং তাদের দুজনের জীবনের এক অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার দিকে।

.

জাহাজ সমুদ্রে পড়েছে। বিস্তীর্ণ জলরাশি ও অনন্ত নীল আকাশ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

একদিন দুপুরে বিমল সুরেশ্বরকে উত্তেজিত সুরে ডাক দিয়ে বললে–চট করে চলে আসুন, দেখুন, কী একটা জন্তু!

জন্তুটা আর কিছু নয়, উড্ডীয়মান মৎস্য। জাহাজের শব্দে জল থেকে উঠে খানিকটা উড়ে আবার জলে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। জীবনে এই প্রথম সুরেশ্বর উড্ডীন মৎস্য দেখলে; ছেলেবেলায় চারুপাঠে ছবি দেখেছিল বটে।

মাঝে মাঝে অন্য অন্য জাহাজের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। প্রায়ই কলিকাতাগামী জাহাজ।

ওরা জাহাজের নাম পড়ছে–ওরা কেন, সবাই। এ অকূল জলরাশির দেশে অন্য একখানা জাহাজ ও অন্য লোকজন দেখতে পাওয়া যেন কত অভিনব দৃশ্য! শতশত যাত্রী ঝুঁকে পড়েছে সাগ্রহে রেলিংয়ের ওপর, নাম পড়ছে, কত কী মন্তব্য করছে। ওরাও নাম পড়লে– একখানার নাম ড্যাবহাউসি, একখানার নাম ইরাবতী, একখানার নামের কোনো মানে হয় না–কিলাওয়াজা–অন্তত ওরা তো কোনো মানে খুঁজে পেলে না। একখানা জাপানি এন. ওয়াই.কে. লাইনের জাহাজ হিদজুমারু, উদীয়মান সূর্য আঁকা পতাকা ওড়ানো।

দু-দিনের দিন রাত্রে বেসিন লাইট হাউসের আলো ঘুরে ঘরে জ্বলতে দেখা গেল।

সুরেশ্বর সমুদ্র-পীড়ায় কাতর হয়ে পড়েছে, কিন্তু বিমল ঠিক খাড়া আছে, যদিও তার খাওয়ার ইচ্ছা প্রায় লোপ পেয়েচে। সুরেশ্বর তো কিছুই খেতে পারে না, যা খায় পেটে তলায় না, দিনরাত কেবিনে শুয়ে আছে, মাথা তুলবার ক্ষমতা নেই।

জাহাজের স্টুয়ার্ড এসে দেখে গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে চলে যায়।

কী বিশ্রী জিনিস এই পরের চাকরি! এত হাঙ্গামা পোয়ানো কি ওর পোয়? দিব্যি ছিল, বাড়িতে খাচ্ছিল-দাচ্ছিল। চাকরির খাতিরে বিদেশে বেরিয়ে কী ঝকমারি দেখো তো!

বিমল আপন মনে ডেকে বসে বই পড়ে, ঘূর্তিতে শিস দেয়, গান করে। সুরেশ্বরকে ঠাট্টা করে বলে–হোয়াট এ গুড সেলার ইউ আর!

তিন দিন দুই রাত্রি ক্রমাগত জাহাজে চলবার পরে তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় এলিফ্যান্ট পয়েন্টের লাইট হাউস দেখা গেল।

বেলাভূমি যদিও দেখা যায় না, তবুও সমুদ্রের জলের ঘোর নীল রং ক্রমশ সবুজ হয়ে ওঠাতে বোঝা গেল যে ডাঙা বেশি দূরে নেই। ডাঙার গাছপালা মাঝে মাঝে জলে ভাসতে দেখা যাচ্ছে।

সন্ধ্যার অল্প পরেই জাহাজ ইরাবতীর মোহনায় প্রবেশ করলে। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের সাইরেন বেজে উঠল, রয়েল মেলের নিশান উঠিয়ে দেওয়া হল মাস্তুলে। সন্ধ্যাকাশ

তখনও যেন লাল। সন্ধ্যাতারার সঙ্গে চাঁদ উঠেছে পশ্চিমাকাশে–ইরাবতীবক্ষে চাঁদের ছায়া পড়েছে।

জাহাজ কিছুদূর গিয়ে নোঙর ফেললে। রাত্রে ইরাবতী নদীতে বড়ো জাহাজ চালানোর নিয়ম নেই। রেঙ্গুনের পাইলট রাত্রে জাহাজে থাকবে সকালে ইরাবতী বক্ষে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে।

ভোরবেলায় কেবিন থেকে ঘুম চোখে বেরিয়ে এসে সুরেশ্বর দেখলে জাহাজ চলছে ইরাবতীর দুই তীরের সমতলভূমি ও ধানখেতের মধ্যে দিয়ে। যতদূর চোখ যায় নিম্ন বঙ্গের মতো শস্যশ্যামলা ঘন সবুজ ভূমি, কাঠের ঘরবাড়ি। তারপরেই রেঙ্গুনে পৌঁছে গেল জাহাজ।

সুরেশ্বর বা বিমল কেউ রেঙ্গুনে নামবে না। সুরেশ্বরের রেঙ্গুনে কাজ আছে বটে কিন্তু সে ফিরবার মুখে। ওরা দুজনেই এ জাহাজ থেকে সিঙ্গাপুরগামী জাহাজে ওদের জিনিসপত্র রেখে শহর বেড়াতে বেরোলো।

বেশি কিছু দেখবার সময় নেই। দুপুরের পরেই সিঙ্গাপুরের জাহাজ ছাড়বে, জাহাজের পার্সার বলে দিলে বেলা সাড়ে বারোটার আগেই ফিরে আসতে।

নতুন দেশ, নতুন মানুষের ভিড়। ওরা যা কিছু দেখছে, বেশ লাগছে ওদের চোখে। লেক, পার্ক ও সোয়েডাগোং প্যাগোডা দেখে ওরা জাহাজে ফিরবার কিছু পরেই জাহাজ ছেড়ে দিলে।

আবার অকূল সমুদ্রে অনন্ত জলরাশি।

একদিন সুরেশ্বর বিমলকে বললে–দেখো বিমল, কাল রাত্রে বড়ো একটা মজার স্বপ্ন দেখেছি–এ কয়দিনের মেলামেশায় তাদের পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা তুমি-তে পৌঁচেছে।

কী স্বপ্ন?

তুমি আর আমি ছোটো একটা অদ্‌ভুত গড়নের বজরা নৌকা করে সমুদ্রে কোথায় যাচ্ছি। সে ধরনের বজরা আমি ছবিতে দেখেছি, ঠিক বোঝাতে পারছি নে এখন। তারপর ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল, খালি ধোঁয়া–বিশ্রী কালো ধোঁয়া–

আমরা বাঁচলাম তো! না খসলাম?

কথা শেষ করে বিমল হো হো করে হেসে উঠল। সুরেশ্বর চুপ করে রইল।

বিমল বললে–আমি একটা প্রস্তাব করি শোনো। চলো দু-জনে সিঙ্গাপুর গিয়ে একটা জায়গা বেছে নিয়ে ডাক্তারখানা খুলি। তুমি তোমার কোম্পানিকে বলে ওষুধ আনাবে। বেশ ভালো হবে। আমি ডাক্তারি করব।

রেঙ্গুন থেকে জাহাজ ছেড়ে দুইদিন দুই রাত অনবরত যাওয়ার পরে চতুর্থ দিন ভোরে জমি দেখা গেল! রেঙ্গুনের মতো সমতলভূমি নয়, উঁচু-নীচু, যেদিকে চাও সেদিকে পাহাড়। উপকূলের চতুর্দিকেই মাছ ধরবার বিপুল আয়োজন, বড়ো বড়ো কালো রঙের খুঁটি দিয়ে ঘেরা, জাল ফেলা। জেলেদের থাকবার টিনের ঘর। পালতোলা জেলে-ডিঙিতে অহরহ তীর আচ্ছন্ন।

পিনাং বন্দরে জাহাজ ঢুকবামাত্রই অসংখ্য সামপান এসে জাহাজের চারিধারে ঘিরলে। মাঝিরা সকলেই চীনেম্যান।

ওরা সামপানে করে বন্দরে নেমে শহর দেখতে বার হল। ঘণ্টা হিসেবে দু-জনে একখানা রিকশা করলে–ঘণ্টা-পিছু কুড়ি সেন্ট ভাড়া।

পিনাঙে ঠিক সমুদ্রতীরে একটু সমতলভূমি, চারিদিকেই পাহাড়, অনেকগুলো ছোটো নদী এই সব পাহাড় থেকে বার হয়ে শহরের মধ্যে দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে।

ওরা একটা পাহাড়ের ওপর চীনা মঠ দেখতে গেল। পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি, বাগান, পুরোহিতের ঘর, দেবমন্দির স্তরে স্তরে উঠেছে। বাগানের চারিদিকে নালার ঝরনার স্রোতে কত পদ্মগাছ। মন্দিরের মধ্যে টেস্ট ধর্মজ দেবমূর্তি।

এদের মধ্যে একটি মূর্তি দেখে সুরেশ্বর চমকে দাঁড়িয়ে গেল।

কোন চীনা দেবতার মূর্তি, কুটি-কুটিল, কঠিন রুক্ষ মুখ। হাতে অস্ত্র, দাঁড়াবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত আক্রোশপূর্ণ। সমস্ত পৃথিবী যেন ধ্বংস করতে উদ্যত।

বিমল বললে–কী, দাঁড়ালে যে?

দেখছ মূর্তিটা? মুখ-চোখের কী ভয়ানক নিষ্ঠুর ভাব দেখেছ?

মন্দিরের পুরোহিতদের জিজ্ঞেস করে জানা গেল ওটি টেস্ট রণ দেবতার মূর্তি।

হঠাৎ সুরেশ্বর বললে–চলো, এখান থেকে চলে যাই।

বিস্মিত বিমল বললেও কী। পাহাড়ের উপরে যাবে না?

www.bengaliebook.com

সুরেশ্বর আর উঠতে অনিচ্ছুক দেখে বিমল ওকে নিয়ে জাহাজে ফিরল।

পথে বললে–তোমার কী হল হে সুরেশ্বর? ওরকম মুখ গম্ভীর করে মনমরা হয়ে পড়লে কেন?

সুরেশ্বর বললে–কই না, ও কিছু নয়, চলো।

জাহাজে ফিরে এসেও কিন্তু সুরেশ্বরের সে ভাব দূর হল না। ভালো করে কথা কয় না, কী যেন ভাবছে। নৈশভোজের টেবিলে ও ভালো করে খেতেও পারলে না।

রাত ন-টার পরে পিনাং থেকে জাহাজ ছাড়লে সুরেশ্বর যেন কিছু স্বস্তি অনুভব করলে। পিনাং বন্দরের জেটির আলোকমালা দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, ওরা ডেকে এসে বসেছে নৈশভোজের পরে।

হঠাৎ সুরেশ্বর বলে উঠল–উঃ কী ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম ওই চীনাদেবতার মূর্তিটা দেখে!

বিমল হেসে বললে–আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু, সত্যি তুমি এত ভীতু তা তো জানি নে! স্বীকার করি মূর্তিটা অবিশ্য কমনীয় নয়, তবুও

সুরেশ্বর গম্ভীর মুখে বললে–আমার মনে হচ্ছে কী জান বিমল? আমরা যেন এই দেবতার কোপদৃষ্টিতে পড়ে গিয়েছি। সবসময় সব জায়গায় যেতে নেই। আমরা সন্ধ্যাবেলা ওই চীনে মন্দিরে গিয়ে ভালো কাজ করিনি।

পিনাং থেকে ছাড়বার তিন দিন পরে জাহাজ সিঙ্গাপুর পৌঁছোলো।

দূর থেকে সিঙ্গাপুরের দৃশ্য দেখে বিমল ও সুরেশ্বর খুব খুশি হয়ে উঠল। শুধু মালয় উপদ্বীপ কেন সমগ্র এশিয়ার মধ্যে সিঙ্গাপুর একটি প্রধান বন্দর, বন্দরে ঢুকবার সময়েই তার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল!

অসংখ্য ছোটো ছোটো পাহাড় জলের মধ্য থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, তাদের ওপর সুদৃশ্য ঘরবাড়ি–চারিদিকে পিনাং-এর মতো মাছ ধরবার প্রকান্ড আড্ডা! নীল রং-এ চিত্রিত চক্ষু ড্রাগন, ঝোলানো পালতোলা সেই চীনা জাঙ্ক ও সামপানে সমুদ্রবক্ষ আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

বন্দরে ঢোকবার মুখেই একখানা ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজ প্রায় মাঝ-দরিয়ায় নোঙর করে আছে। কয়লা নেবার জন্যে। তার প্রকান্ড ফোকরওয়ালা দুই কামান ওদের দিকে মুখ হাঁ করে আছে। যেন ওদের গিলবার লোভে। আরও নানা ধরনের জাহাজ, স্টিমলঞ্চ, সামপানে, মালয় নৌকার ভিড়ে বন্দরের জল দেখা যায় না। যেদিকে চোখ পড়ে শুধু নৌকো আর জাহাজ, বিমলের মনে হল কলকাতা এর কাছে কোথায় লাগে? তার চেয়ে অন্তত দশগুণ বড়ো বন্দর।

চারিধারেই বারসমুদ্র, বন্দরের মুখে ছোটো-বড়ো জাহাজ দাঁড়িয়ে, তাদের মধ্যে আর দু খানা বড়ো যুদ্ধ-জাহাজ ওদের চোখে পড়ল। বন্দরে উত্তর-পূর্ব কোণে তিন মাইলের পরে বিখ্যাত নৌবহরের আড্ডা। দূর থেকে দেখা যায়, বড়ো বড়ো ইস্পাতের খুঁটি, বেতারের মাস্তুলে সে-দিকটা অরণ্যের সৃষ্টি করেছে।

জাহাজের কয়লা নেবার একটা প্রধান আড্ডা সিঙ্গাপুর। পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণ থেকে পূর্বগামী সব রকম জাহাজকেই এখানে দাঁড়াতে হবে কয়লার জন্যে। এর বিপুল ব্যবস্থা আছে, বহুদূর ধরে পর্বতাকারে কয়লা রক্ষিত হয়েছে, যেন সমুদ্রের ধারে ধারে অনেক দূর পর্যন্ত একটা অবিচ্ছিন্ন কয়লার পাহাড়ের সারি চলে গিয়েছে।

বন্দরে জাহাজ এসে থামলে সুরেশ্বর ও বিমল চীনে কুলি দিয়ে মালপত্র এনে দু-খানা রিকশা ভাড়া করলে। ওরা দুজনেই একটা ভারতীয় হোটেল দেখে নিয়ে সেখানে উঠল। বিকালের দিকে সুরেশ্বর তার ওষুধের ফার্মের কাজে কয়েক জায়গায় ঘুরে এল, বিমল যে ভদ্রলোকের নামে চিঠি এনেছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

সন্ধ্যার পূর্বে সুরেশ্বর জিজ্ঞেস করলে, কী হয়েছে? অমনভাবে বসে কেন?

বিমল বললে–ভাই এতদূরে পয়সা খরচ করে আসাই মিথ্যে হল। আমি যা ভেবে এখানে এলুম তা হবার কোনো আশা নেই। যে ভদ্রলোকের নামে চিঠি এনেছিলাম, তাঁর নিজের ভাগনে ডাক্তার হয়ে এসে বসেছে। আমার কোনো আশাই নেই।

সুরেশ্বর বললে–তাতে কী হয়েছে? এত বড় সিঙ্গাপুর শহরে দু-জন বাঙালি ডাক্তারের স্থান হবে না? ক্ষেপেছ তুমি? আমি ওষুধের দোকান খুলছি, তুমি সেখানে ডাক্তার হয়ে বোসো! দেখো কী হয় না হয়।

হঠাৎ সুরেশ্বরের মনে হল তাদের ঘরের বাইরে জানালার কাছে কে যেন একজন ওদের কথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে।

বিমল বললে–ও কে?

সুরেশ্বর তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে। তার মনে হল একজন যেন বারান্দার মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সে ফিরে এসে বললে–ও কিছু না, কে একজন গেল।

তারপর ওরা দু-জনে অনেক রাত পর্যন্ত সিঙ্গাপুরের ভারতীয় পাড়ায় একখানা ওষুধের দোকান খুলবার সম্বন্ধে জল্পনা করলে। বিমল হাজার খানেক টাকা এখন ঢালতে প্রস্তুত আছে, সুরেশ্বর নিজেদের ফার্মকে বলে ওষুধের জোগাড় করবে।

বড়ো ডাকঘরের ক্লক টাওয়ারে ঢং ঢং করে রাত এগারোটা বাজল। হোটেলের চাকর এসে দু-জনের খাবার দিয়ে গেল। শিখের হোটেল, মোটা মোটা সুস্বাদু রুটি ও মাংস, আস্ত মাসকলায়ের ডাল ও আলুর তরকারি–এই আহার্য। সারাদিনের ক্লান্তির পরে তা অমৃতের মতো লাগল ওদের।

আহারাদি সেরে সুরেশ্বর শোবার জোগাড় করতে যাচ্ছে এমন সময় বিমল হঠাৎ দরজার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে।

সুরেশ্বর বললে–কী?

বিমল ফিরে এসে বিছানায় বসল। বললে–আমার ঠিক মনে হল কে একজন জানলাটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। কাউকে দেখলুম না কিন্তু–

সুরেশ্বরের কীরকম সন্দেহ হল। বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, নানারকম বিপদের আশঙ্কা এখানে পদে পদে। সে বললে–সাবধান থাকাই ভালো। দরজা বেশ বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়ো। রাতও হয়েছে অনেক।

সুরেশ্বরের ঘুম ছিল সজাগ। তা অনেক রাত্রে একটা কীসের শব্দে ও ঘুম ভেঙে বিছানার ওপর উঠে বসল সন্দিগ্ধ মন নিয়ে।

বিছানার শিয়রের দিকে জানলাটা খোলা ছিল। বিছানা ও জানলার মধ্যে একটা ছোটো টেবিলের দিকে নজর পড়াতে সুরেশ্বর দেখলে টেবিলটার ওপর ঢিল জড়ানো একটুকরো কাগজ। এটাই বোধ হয় একটু আগে জানলা দিয়ে এসে পড়েছে, তার শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছে। ঘরে আলো জ্বালাই ছিল। কাগজের টুকরোটা ও পড়লে, তাতে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে–

আপনারা ভারতীয়! যতদূর জানতে পেরেছি সিঙ্গাপুরে আপনারা নবাগত ও চিকিৎসা ব্যবসায়ী। কাল দুপুর বেলা বোটানিক্যাল গার্ডেনে অর্কিডের ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে

যে বড়ো ডুরিয়ান ফলের গাছ আছে, তার নীচে অপেক্ষা করবেন দু-জনেই। আপনাদের দু জনের পক্ষেই লাভজনক কোনো প্রস্তাব উত্থাপিত হবে। আসতে ইতস্তত করবেন না।

লেখার নীচে নাম-সই নেই।

বিমলও কাগজখানা পড়লে।

ব্যাপার কী? এ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ দু-জনেই নীরব।

সুরেশ্বর প্রথমে কথা বললে। বললে–কেউ তামাশা করেছে বলে মনে হচ্ছে, কী বলো? কিন্তু তাই বা করবে কে, আমাদের চেনেই-বা কে?

বিমল চিন্তিত মুখে বললে–কিছু বুঝতে পারছি নে। কোনো খারাপ উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না কি?

কী খারাপ উদ্দেশ্য আমরা যে খুব বড়োলোক নই, তার প্রমাণ ভিক্টোরিয়া হোটেল বা এম্পায়ার হোটেলে না উঠে এখানে উঠেছি। টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়েও যাচ্ছিনে। সুতরাং কী করতে পারে আমাদের?

সে রাত্রের মতো দু-জনে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠে বিমল বললে–চলে যাওয়াই যাক। এত ভয় কীসের? বোটানিক্যাল গার্ডেন তো আর নির্জন মরুভূমি নয়, সেখানে কত লোক বেড়ায় নিশ্চয়ই। দু-জনকে খুন করে দিনের আলোয় টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়ে যাবে, এত ভরসা কারোর হবে না।

দুপুরের পরে হোটেল থেকে বেরিয়ে কুয়ালা জোহোর স্ট্রিটের মোড় থেকে একখানা রিকশা ভাড়া করলে। ম্যাসিডন কোম্পানির সোডাওয়াটারের দোকানের সামনে একজন চীনা ভদ্রলোক ওদের রিকশা থামিয়ে চীনে রিকশাওয়ালাকে কী জিজ্ঞেস করলে। তারপর উত্তর পেয়ে লোকটি চলে গেল। বিমল রিকশাওয়ালাকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলে–কী বললে তোমাকে হে?

রিকশাওয়ালা বললে–জিজ্ঞেস করলে সওদাগরি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

তুমি কী বললে?

অমি কিছু বলিনি। বলবার নিয়ম নেই আমাদের। সিঙ্গাপুর খারাপ জায়গা, মিস্টার। বোটানিক্যাল গার্ডেন শহর ছাড়িয়ে প্রায় দু-মাইল দূরে। শহর ছাড়িয়েই প্রকান্ড একটা কীসের কারখানা। তারপর পথের দু-ধারে ধনী মালয়, ইউরোপীয় ও চীনাদের বাগানবাড়ি। এমন ঘন সবুজ গাছপালার সমাবেশ ও শোভা, বিমল ও সুরেশ্বর বাংলা দেশের ছেলে হয়েও দেখেনি –কারণ বিষুব রেখার নিকটবর্তী এইসব স্থানের মতো উদ্ভিদ সংস্থান ও প্রাচুর্য পৃথিবীর অন্য কোথাও হওয়া সম্ভব নয়।

মাঝে মাঝে রবারের বাগান।

বোটানিক্যাল গার্ডেনে পৌঁছে ওরা রিকশাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে বিদেয় করলে। প্রকান্ড বড়ো বাগান। কত ধরনের গাছপালা, বেশিরভাগই মালয় উপদ্বীপজাত। বড়ো বড়ো রুটিফলের গাছ, ডুরিয়ান পাকবার সময় বলে ডুরিয়ান ফলের গাছের নীচে দিয়ে যেতে। পাকা ডুরিয়ান ফলের দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে।

সিঙ্গাপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের নারিকেলকুঞ্জ একটি অদ্ভুত সৌন্দর্যময় স্থান। এত উঁচু উঁচু নারিকেল গাছের এমন ঘন সন্নিবেশ ওরা কোথাও দেখেনি। নিস্তব্ধ দুপুরে নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর মাথায় কী পাখি ডাকছে সুস্বরে, আকাশ সুনীল, জায়গাটা বড়ো ভালো লাগল ওদের। অর্কিডহাউস খুঁজে বার করে তার উত্তর-পূর্ব কোণে সত্যিই খুব বড়ো একটা ডুরিয়ান ফলের গাছ দেখা গেল। সে ঘাছেরও ফল পেকে যথারীতি দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে।

বিমল বললে–একটু সতর্ক থাকো। দেখা যাক না কী হয়!

সবুজ টিয়ার ঝাঁক গাছের ডালে ডালে উড়ে বসছে। একটা অপূর্ব শান্তি চারিদিকে ওরা দু-জনে ডুরিয়ান গাছের ছায়ায় শুকনো তালপাতা পেতে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

মিনিট তিনও হয়নি, এমন সময় কিছুদূরে এক মাদ্রাজি ও একজন চীনা ভদ্রলোককে ওদের দিকে আসতে দেখা গেল।

সুরেশ্বর ও বিমল দু-জনেই উঠে দাঁড়াল।

ওরা কাছে এসে অভিবাদন করলে। মাদ্রাজি ভদ্রলোকটি অত্যন্ত সুপুরুষ ও সুবেশ, তিনি বেশ পরিষ্কার ইংরেজিতে বললেন–আপনারা ঠিক এসেছেন তাহলে। তিনি মি. আ-চীন, স্থানীয় কনসুলেট অফিসের মিলিটারি অ্যাটাসে। আমার নাম সুব্বা রাও।

পরস্পরের অভিবাদন-বিনিময় শেষ হবার পর চারজনই সেই ডুরিয়ান গাছের তলায় বসল। সমগ্র বোটানিক্যাল গার্ডেনে এর চেয়ে নির্জন স্থান আছে কিনা সন্দেহ।

সুব্বা রাও বললেন–প্রথমেই একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনারা দুজনেই উপাধিকারী ডাক্তার তো? সুরেশ্বর বললে, সে ডাক্তার নয়, ঔষধ-ব্যবসায়ী। বিমল পাস করা ডাক্তার।

একথার উত্তরে আ-চীন বললে–দু-জনকেই আমাদের দরকার। একটা কথা প্রথমেই বলি, আমাদের দেশ ঘোর বিপন্ন। আমরা ভারতের সাহায্য চাই। জাপান অন্যায়ভাবে আমাদের আক্রমণ করছে, দেশে খাদ্য নেই, ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই। আমরা গোপনে ডাক্তারি ইউনিটি গঠন করে দেশে পাঠাচ্ছি। কারণ আইনত বিদেশ থেকে আমরা তা সংগ্রহ করতে পারি না। আপনারা বুদ্ধের দেশের লোক, আমরা আপনাদের মন্ত্রশিষ্য। আমাদের সাহায্য করুন। এর বদলে আমাদের দরিদ্র দেশ দু-শো ডলার মাসিক বেতন ও অন্যান্য খরচ দেবে। এখন আপনারা বিবেচনা করে বলুন আপনাদের কী মত?

সুরেশ্বর বললে–যদি রাজি হই, কবে যেতে হবে।

এক সপ্তাহের মধ্যে। লুকিয়ে যেতে হবে, কারণ এখন হংকং যাবার পাসপোর্ট আপনারা পাবেন না। আমার গভর্নমেন্ট সে-ব্যবস্থা করবেন ও আপনাদের এখানে এই এক সপ্তাহ থাকার খরচ বহন করবেন। আপনারা যদি রাজি হন, আমার গভর্নমেন্ট আপনাদের কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবেন।

সুব্বা রাও বললেন–জবাব এখুনি দিতে হবে না। ভেবে দেখুন আপনারা। আজ সন্ধ্যাবেলা জোহোর স্ট্রিটের বড়ো পার্কের ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ডের কাছে আমি ও আ-চীন থাকব। কিন্তু দয়া করে কাউকে জানাবেন না।

ওরা চলে গেলে বিমল বললে–কী বল সুরেশ্বর, শুনলে তো সব ব্যাপার?

সুরেশ্বর বললে–চলো যাই। এখন আমাদের বয়স কম, দেশ-বিদেশে যাবার তো এই সময়। একটা বড়ো যুদ্ধের সময় মেডিক্যাল ইউনিটে থাকলে ডাক্তার হিসেবে তোমারও অনেক জ্ঞান হবে। চীনদেশটাও দেখা হয়ে যাবে পরের পয়সায়।

বিমল বললে–আমার তো খুবই ইচ্ছে, শুধু তুমি কী বল তাই ভাবছিলুম।

সন্ধ্যাবেলায় ওরা এসে জোহোর স্ট্রিটের পার্কের ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ডের কোণে আ-চীন ও সুব্বা রাওয়ের সাক্ষাৎ পেলে। ওদের সব কথাবার্তা শুনে আ-চীন বললে–তাহলে আপনাদের রওনা হতে হবে কাল রাত্রে। ক-দিনে আপনাদের হোটেলের বিল যা হয়েছে তা কাল বিকালেই চুকিয়ে দিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে আপনারা এইখানে অপেক্ষা করবেন। বাকি ব্যবস্থা আমি করব। আর এই নিন–

কথা শেষ করে বিমলের হাতে একখানা কাগজ গুঁজে দিয়ে আ-চীন ও সুব্বা রাও চলে গেলেন।

বিমল খুলে দেখলে কাগজখানা এক-শো ডলারের নোট।

পরদিন সকাল থেকে ওরা বাড়িতে চিঠিপত্র লেখা, কিছু কিছু জিনিসপত্র কেনা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত রইল। বৈকালে নির্দেশমতো আবার ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ডের কোণে এসে দাঁড়াল।

একটু পরেই আ-চীন এলেন। বিমলকে জিজ্ঞেস করলেন—

আপনাদের জিনিসপত্র?

হোটেলেই আছে।

হোটেলে রেখে ভালো করেননি। একখানা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে গিয়ে জিনিসপত্র তুলে এখানে নিয়ে আসুন। আমি এখানেই থাকি। পার্কের কোণে ছোটো রাস্তাটার ওপর গাড়ি দাঁড় করিয়ে হর্ন দিতে বলবেন। আপনাদের আর কিছু লাগবে?

না, ধন্যবাদ। যা দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট।

আধঘণ্টার মধ্যেই বিমল ও সুরেশ্বর ট্যাক্সিতে ফিরে পার্কের কোণে দাঁড়িয়ে হর্ন দিতে লাগল।

আ-চীন এসে ওদের গাড়িতে উঠে মালয় ভাষায় ড্রাইভারকে কী বললেন। সে ট্যাক্সি বড়ো পোস্ট অফিসের সামনে এসে দাঁড় করালো।

বিমল বললে–এখানে কী হবে?

বিমলের কথা শেষ হতে-না-হতে ওদের ট্যাক্সির পাশে একখানা নীল রংয়ের হুইপেট গাড়ি এসে দাঁড়াল। স্টিয়ারিং ধরে আছে একজন চীনা ড্রাইভার।

আ-চীন বললেন–উঠুন পাশের গাড়িতে।

পরে তাঁর ইঙ্গিত মতো দু-জন ড্রাইভার মিলে জিনিসপত্র সব নতুন গাড়িখানায় তুলে দিলে। গাড়ি যখন তিরবেগে সিঙ্গাপুরের অজানা বড়ো রাস্তা বেয়ে চলেছে, তখন

বিমল বললে–অত সদরে দাঁড়িয়ে ও ব্যবস্থা করলেন কেন? কেউ যদি টের পেয়ে থাকে?

আ-চীন বললেন–কেউ করবে না জানি বলেই ওই ব্যবস্থা। এ সময়ে চীনা ডাক নিতে রোজ কনসুলেট অফিসের লোক ওখানে আসবে সকলেই জানে। আমার পরনে কনসুলেট ইউনিফর্ম, আমি লুকিয়ে কোনো কাজ করতে গেলেই সন্দেহের চোখে লোকে দেখবে। সদরে কেউ কিছু হঠাৎ মনে করবে না।

একটু পরেই সমুদ্র চোখে পড়ল–নারিকেল শ্রেণির আড়ালে। শহর ছাড়িয়ে একটু দূরে একটা নিভৃত স্থানে এসে গাড়ি একটা বাংলোর কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকল। পাশেই নীল সমুদ্র।

আ-চীন বললেন–এখানে নামতে হবে। বাংলোর একটা ঘরে ওদের বসিয়ে আ-চীন বললেন–আমি যাই। এখানে নিশ্চিন্ত মনে থাকুন। কোনো ভয় নেই। যথাসময়ে আপনাদের খাবার দেওয়া হবে। বাকি ব্যবস্থা সব রাত্রে।

তিনি চলে গেলেন। একটু পরে জনৈক চীনা ভৃত্য ছোটো ছোটো পেয়ালায় সবুজ চা ও কুমড়োর বিচির কেক নিয়ে ওদের সামনে রাখলে।

বিমল বললে–এ আবার কী চিজ বাবা? ইঁদুর ভাজা-টাজা নয় তো?

সুরেশ্বর বললে–ইঁদুর নয়, কুমড়োর বিচি, তা স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে। তবে ইঁদুর খাওয়া অভ্যেস করতে হবে, নইলে হরিমটর খেয়ে থাকতে হবে চীন দেশে।

কিন্তু কেকগুলি ওদের মন্দ লাগল না। চা পানের পরে ওরা বাংলোর চারিধারে একটু ঘুরে বেড়ালে। সিঙ্গাপুরের উপকণ্ঠে নির্জন স্থানে সমুদ্রতীরে বাংলোটি অবস্থিত। সমুদ্রের দিকে এক সারি ঝাউ অপরাহ্নে বাতাসে সোঁ সোঁ করছিল। দূরে সমুদ্র বক্ষে অস্তসূর্যের আভা পড়ে কী সুন্দর দেখাচ্ছে।

সুরেশ্বর ভাবছিল হুগলি জেলার তাদের সেই গ্রাম, তাদের পুরোনো বাড়ি–বাপ-মায়ের কথা। জীর্ণ, সান-বাঁধানো পুকুরের ঘাটের পৈঠা বেয়ে মা পুকুরে গা ধুতে নামছেন এতক্ষণ।

জীবনের কীসব অদ্ভুত পরিবর্তনও ঘটে! তিন মাস মাত্র আগে সেও এমনি সন্ধ্যায় ওই গ্রামের খালের ধারটিতে একা পায়চারি করে বেড়াত ও কীভাবে কোথায় গেলে চাকরি

পাওয়া যায় সেই ভাবনাতে ব্যস্ত থাকত। আর আজ কোথায় কতদূরে এসে পড়েছে।

বিমল মুগ্ধ হয়েছিল এই সুদূরপ্রসারী শ্যামল সমুদ্র-বেলার সান্ধ্যশোভার দৃশ্যে। সে ভাবছিল কবি ও ঔপন্যাসিকদের পক্ষে এমন বাংলো তো স্বর্গ–মাথার ওপরকার নীল আকাশ–এই সবুজ ঝাউয়ের সারি–ওই সমুদ্রবক্ষের ছোটো ছোটো পাহাড়–সত্যিই স্বর্গ–

গভীর রাত্রে আ-চীন এসে ওদের ওঠালেন। একখানা মোটরে আধ মাইল আন্দাজ গিয়ে সমুদ্রতীরের একটা নির্জন স্থানে ওরা জিনিসপত্র সমেত ছোটো একটা জালি বোটে উঠল। দূরে বন্দরের আলোর সারি দেখা যাচ্ছে–অন্ধকার রাত্রি, নির্জন সমুদ্র বক্ষ। কিছুদূরে একটা চীনা জাঙ্ক অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল–জালিবোট গিয়ে জাঙ্কের গায়ে লাগল।

দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওরা জাঙ্কে উঠল।

পাটাতনের নীচে একটা ছোটো কামরা ওদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। কামরাতে একটা চীনা মাদুর বিছানো, বেতের বালিশ, চীনা লণ্ঠন, রঙিন গালার পুতুল, কাঁচকড়ার ফুলের টবে নার্সিসাস ফুল গাছ–এমনকী ছোটো খাঁচাসমেত একটি ক্যানারি পাখি।

আ-চীন বললেন–কামরা আপনাদের পছন্দ হয়েছে তো?

সুরেশ্বর বললে–সুন্দর সাজানো কামরা। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আ-চীন গম্ভীরভাবে বললেন–ধন্যবাদ আপনাদের। আমাদের বিপন্ন দেশকে দয়া করে আপনারা সাহায্য করবার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করে অজানা ভবিষ্যতের দিকে চলেছেন। ভগবান যুদ্ধের দেশের লোক আপনারা–সবসময়েই আপনারা আমাদের নমস্য। ভগবান বুদ্ধের আশীর্বাদ আপনাদের ওপর বর্ষিত হোক।

সুরেশ্বর বললে–আপনি তো সঙ্গে যাবেন না।–এ নৌকো ঠিক জায়গায় আমাদের নিয়ে যাবে তো?

সে বিষয় ভাববেন না। এ চীন গভর্নমেন্টের বেতনভোগী জাঙ্ক। তিন দিন পরে একখানা চীনা জাহাজ আপনাদের তুলে নেবে। কারণ সামনে দুস্তর চীন সমুদ্র। জাঙ্কে সে-সমুদ্র পার হওয়া তো যাবে না।

আ-চীন বিদায় নেবার পরে নৌকা নোঙর ওঠালে। জাঙ্কের সুসজ্জিত কামরায় মোমবাতির আলো জ্বলছে। অনুকূল বায়ুভরে চীন সমুদ্র বেয়ে নৌকো চলেছে–ঘন

অন্ধকার, কেবল আলোকোৎক্ষেপক ঢেউগুলি যেন জোনাকির ঝাঁকের মতো জ্বলছে।

বিমল বললে–এখান থেকে হংকং সতেরো-শো আঠেরো-শো মাইল দূর। এক ভীষণ চীনসমুদ্র–আর এই জাঙ্ক তো এখানে মোচার খোলা। প্রাণ নিয়ে এখনডাঙায় পা দিতে পারলে তো হয়।

সুরেশ্বর বললে–এসে ভালো করোনি বিমল। ঝোঁকের মাথায় তখন দু-জনেই আ-চীনের কথায় ভুলে গেলুম কেমন–দেখলে? এই জাঙ্কে যদি তোমায় আমায় খুন করে এরা জলে ভাসিয়ে দেয়, এদের কে কী করবে? কেউ জানে না আমরা কোথায় আছি। কেউ একটা খোঁজ পর্যন্ত করবে না।

বিমল বললে–ও সব কথা ভেবে কেন মন খারাপ কর? বাইরে যেয়ে সমুদ্রের দৃশ্যটা একবার দেখো। ফসফোরেসেন্ট ঢেউগুলি কী চমৎকার দেখাচ্চে? মাঝে মাঝে কেমন একপ্রকার শব্দ হচ্ছে সমুদ্রের মধ্যে। ওগুলো কী? ওরা কাউকে কিছু বলতে পারে না, ইংরেজি ভাষা কে জানে নৌকোয়, তা ওদের জানা নেই। রাত্রে ওদের ঘুম হল না। ক্রমে পুব দিক ফর্সা হয়ে এল, রাত ভোর হয়ে গেল। একটু পরে সূর্য উঠল।

সকাল থেকে নৌকা ভয়ানক নাচুনি ও দুলুনি শুরু করে দিল। চীন সমুদ্র অত্যন্ত বিপজ্জনক, সর্বদা চঞ্চল, ঝড় তুফান লেগেই আছে। ওরা সমুদ্রপীড়ায় কাতর হয়ে কামরার মধ্যে ঢুকে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। আহার বিহারে রুচি রইল না।

সেদিন বিকেলে এক মস্ত ঢেউয়ের মাথায় একটি কাটল ফিস এসে পড়লে জাঙ্কের পাটাতনে। সেটা তখনও জ্যান্ত, পালাবার আগেই চীনা মাঝিরা ধরে ফেললে।

জাঙ্কে যা খাবার দেয়, সে ওদের মুখে ভালো লাগে না। ভাত ও সুটকি মাছের তরকারি। সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত দু-টি বাঙালি যাত্রীর পক্ষে চীনা ভাত-তরকারি খাওয়া প্রায় অসম্ভব।

সুরেশ্বর বললে-ঝকমারি করেছি এসে ভাই। না খেয়ে তো দেখছি আপাতত মরতে হবে।

তৃতীয় দিন দুপুরে দূরে দিগবলয়ে একখানা বড়ো স্টিমারের ধোঁয়া দেখা গেল। ওরা দেখলে জাঙ্কের সারেং দূরবিন দিয়ে সেদিকে চেয়ে উদবিগ্ন মুখে কী আদেশ দিলে, মাঝিমাল্লারা পাল নামিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। আবার উলটো দিকে যাবে নাকি? ব্যাপার কী?

সুরেশ্বর সারেঙকে জিজ্ঞেস করলে– নৌকো ঘোরাচ্ছে কেন?

সারেং দূরের অস্পষ্ট জাহাজটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে উদবিগ্ন মুখে বললে– ইংলিশ ক্রুজার, মিস্টার, ভেরি বিগক্রুজার–বিগগান–

সুরেশ্বর বললে–তাতে তোমাদের ভয় কী? ওরা তোমাদের কিছু বলতে যাবে কেন?

কিন্তু সুরেশ্বর জানত না সারেং-এর আসল ভয়ের কারণ কোনখানে। চীনা সমুদ্রে চীনা বোম্বেটের উপদ্রব নিবারণের জন্যে ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ সর্বপ্রকার চীনা নৌকো, জাহাজ ও জাঙ্কের ওপর–বিশেষ করে বন্দর থেকে দূরে বার সমুদ্র দিয়ে যেসব যায়– তাদের ওপর খরদৃষ্টি রাখে। ওদের জাঙ্ককে দেখে সন্দেহ হলেই থামিয়ে থানাতল্লাসী করবেই। তাহলে এ জাঙ্কে যে বেআইনি আফিম রয়েছে পাটাতনের নীচে লুকোনো– তা ধরা পড়ে যাবে।

চীনা মাঝিগুলি অতিশয় ধূর্ত। যুদ্ধ জাহাজ দূর থেকে যেমনি দেখা অমনি জাঙ্ক মাঝ সমুদ্রে ঝুপ করে নোঙর নামিয়ে দিলে ও পাটাতনের নীচে থেকে মাছ ধরার জাল বার করে সমুদ্রে ফেলতে লাগল–দেখতে দেখতে জাঙ্কখানা একখানি চীনা জেলে-ডিঙিতে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

বিমল বললে–উঃ কী চালাক দেখেছ!

সুরেশ্বর বললে–চালাক তাই রক্ষে–নইলে ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ এসে যদি আমাদের ধরত –বিনা পাসপোর্টে ভ্রমণ করার অপরাধে তোমায় আমায় জেল খাটতে হবে, সে হুঁশ আছে?

ধূসরবর্ণের বিরাটকায় ব্রিটিশ ক্রুজারখানা ক্রমেই নিকটে এসে পড়ছে। এখন তার বড়ো ফোকরওয়ালা কামানগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের বুকে একটা ধূসরবর্ণের পর্বত যেন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে।

যদি কোনো সন্দেহ করে একটি বড়ো কামান তাদের দিকে দাগে–আর ওদের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে?

চীনা মাঝিমাল্লাগুলি মহাউৎসাহে ততক্ষণ জাল ফেলে মাছ ধরছে। সুরেশ্বর ও বিমলের বুক ঢিপঢিপ করছে উদবেগে ও উত্তেজনায়। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যুদ্ধজাহাজখানা ওদের দিকে লক্ষই করলে না। ওদের প্রায় একমাইল দূরে দিয়ে সোজা পূর্ণবেগে সিঙ্গাপুরের দিকে চলে গেল।

জাঙ্কসুদ্ধ লোক হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

দুপুরের পরে দূরে একটি ছোটো দ্বীপ দেখা গেল।

জাঙ্ক গিয়ে ক্রমে দ্বীপের পাশে নোঙর করলে। বিমল ও সুরেশ্বর শুনলে নৌকোর জল ফুরিয়ে গেছে–এবং এখানে মিষ্ট জল পাওয়া যায়।

ওরা সেখানে থাকতে থাকতে আর একখানা বড়ো জাঙ্ক বিপরীত দিক থেকে এসে ওদের কাছেই নোঙর করলে।

বিমলদের জাঙ্কের মাঝিরা বেশ একটু ভীত হয়ে পড়ল নবাগত নৌকাখানা দেখে। সকলেই ঘন ঘন চকিত দৃষ্টিতে সে-দিকে চায়–যদিও ভয়ের কারণ যে কী তা সুরেশ্বর বা বিমল কেউ বুঝতে পারলে না।

কিন্তু একটু পরে সেটা খুব ভালো করেই বোঝা গেল।

ও নৌকা থেকে দশ-বারোজন গুন্ডা ও বর্বর আকৃতির চীনেম্যান এসে ওদের জাঙ্ক ঘিরে ফেললে। সকলের হাতেই বন্দুক, কারো হাতে ছোরা।

ওদের জাঙ্কের কেউ কোনোরকম বাধা দিলে না–দেওয়া সম্ভবও ছিল না। দস্যুরা দলে ভারি, তা ছাড়া অত বন্দুক এ নৌকোয় ছিল না। সকলের মুখ বেঁধে ওরা নৌকোয় যা কিছু ছিল, সব কেড়ে নিয়ে নিজেদের জাঙ্কে ওঠালে। বিমল ও সুরেশ্বরের কাছে যা ছিল, সব গেল। আ-চীন প্রদত্ত এক-শো ডলারের নোটখানা পর্যন্ত–কারণ সেখানা ভাঙাবার দরকার না হওয়ায় ওদের বাক্সেই ছিল।

চীন সমুদ্রের বোম্বেটের উপদ্রব সম্বন্ধে বিমল ও সুরেশ্বর অনেক কথা শুনেছিল। সিঙ্গাপুরে আরও শুনেছিল যে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন হওয়ায় সমস্ত হংকং-এর নিকটবর্তী সমুদ্রে জড়ো হচ্ছে–এদিকে সুতরাং বোম্বেটেদের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত।

চীন ও মালয় জলদস্যুরা শুধু লুঠপাট করেই ছেড়ে দেয় না–যাত্রীদের প্রাণনষ্টও করে। কারণ এরা বেঁচে ফিরে গিয়ে অত্যাচারের সংবাদ সিঙ্গাপুর বা হংকং-এ প্রচার করলেই চীন ও ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কড়াকড়ি পাহারা বসাবে সমুদ্রে। মরা মানুষ কোনো কথা বলে না–এ প্রাচীন নীতি অনেক ক্ষেত্রেই বড়ো কাজ দেয়।

দেখা গেল বর্তমান দস্যুরা এ নীতি ভালোভাবেই জানে। কারণ জিনিসপত্র ওদের জাঙ্কে রেখে এসে ওরা আবার ফিরে এল বিমলদের নৌকোয়–যেখানে পাটাতনের ওপর মাঝিমল্লার দল সারি সারি মুখ ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে।

বিমল ছিল নিজের কামরায়। সুরেশ্বর কোথায় বিমল তা জানে না। একজন বদমাইশকে ছোরা হাতে ওর কামরায় ঢুকতে দেখে বিমল চমকে উঠল।

লোকটা সম্ভবত চীনাম্যান। বয়স আন্দাজ ত্রিশ, সার্কাসের পালোয়ানের মতো জোয়ান নীল ইজের আর একটি বুক কাটা কোর্তা গায়ে। মুখখানা দেখতে খুব কুশ্রী নয়, কিন্তু কঠিন ও নিষ্ঠুর। ওর হাতে অস্ত্রখানা বিমল লক্ষ করে দেখলে ঠিক ছোরা নয়, মালয় উপদ্বীপে যাকে ক্রিস বলে তাই। যেমনি চকচকে তেমনি সেখানা ক্ষুরধার বলে মনে হল!

সে ক্রিসখানা বিমলের সামনে উঁচু করে তুলে ধরে দেখিয়ে বললে–আমি তোমাকে একটু বিরক্ত করতে এসেছি, কিছু মনে কোরো না।

বিমলের মুখ বাঁধা, সে কী কথা বলবে?

লোকটা পকেট থেকে একটা চামড়ার থলি বার করে সেটার মুখ খুলে বিমলের চোখের সামনে মেলে ধরলে। শুকনো আমচুরের মতো কতকগুলি কী জিনিস তার মধ্যে রয়েছে! বিমল অবাক হয়ে ভাবছে এ জিনিসগুলি কী, বা তাকে এগুলি দেখানোর সার্থকতাই বা কী–এমন সময় লোকটা একটা শুকনো আমচুর বার করে ওর নাকের সামনে ধরে বলে– চিনতে পারলে না কী জিনিস?

বিমল এতক্ষণে জিনিসটা চিনতে পারলে এবং চিনে ভয়ে ও বিস্ময়ে শিউরে উঠল। সেটা একটা কাটা শুকনো কান, মানুষের কান! লোকটা হা হা করে নিষ্ঠুর বিদ্রুপের হাসি হেসে বললে-বুঝেছ এবার? হাঁ, ওটা আমার একটা বাতিক–মানুষের কান সংগ্রহ করা। তোমাকেও তোমার কান দুটির জন্যে একটুখানি কষ্ট দেব। আশা করি মনে কিছু করবে না। এসো, একটু এগিয়ে এসো দেখি।

বিমল নিরুপায়, মুখ দিয়ে একটা কথা বার করবার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই তার। এক মুহূর্তে তার মনে হল হয়তো সুরেশ্বরের সমানই অবস্থা ঘটেছে, এতক্ষণে তারও অশেষ দুর্দশা হচ্ছে এই পীতবর্ণ বর্বরদের হাতে।

বুদ্ধদেবের ধর্মকে এরা বেশ আয়ত্ত করেছে বটে!

লোকটা সময়ের মূল্য বোঝে, কারণ কথা শেষ করেই বুদ্ধশিষ্যের এই বিচিত্র নমুনাটি চকচকে ক্রিসখানা হাতে করে এগিয়ে এল–বিমলের সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল–মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট আর্তনাদ বার হতে চেয়েও হল না, সে প্রাণপণে দুই চোখ বুজলে।

তীক্ষ্ণ ক্রিসের স্পর্শ খুব ঠাণ্ডা–কতটা ঠাণ্ডা, খু-উব ঠাণ্ডা কি? ক্রিসের স্পর্শ এল না, এল তার পরিবর্তে দূর থেকে একটা অস্পষ্ট গম্ভীর আওয়াজ–প্রস্তরময় কূলে সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রবল বেগে আছড়ে পড়ার শব্দের মতো গম্ভীর।

কতকগুলি ব্যস্ত মানুষের সম্মিলিত দ্রুত পদশব্দ বিমলের কানে গেল–বিস্মিত বিমল চোখ খুলে চেয়ে দেখলে লোকটা ছুটে কামরার বাইরে চলে গেল–চারিদিকে একটি সাড়া শোরগোল, কাঠের পাটাতনের ওপর অনেকগুলি পলায়নপর মানুষের দ্রুত পায়ের শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে।

কী ব্যাপার? এ আবার কী নতুন কান্ড?

পরক্ষণেই বিমলের মনে হল তাদের জাঙ্কখানা একটা প্রকান্ড দুলুনি খেয়ে একেবারে কাত হয়ে পড়বার উপক্রম করেই পরমুহূর্তে ঢেউয়ের তালে যেন আকাশে ঠেলে উঠল–নোঙরের শিকলে কড় কড় শব্দে টান ধরল–মজবুত শিকল না হলে সেই হেঁচকাটানে ছিঁড়ে যেত নিশ্চয়ই। একটু পরে বিমলদের নৌকোর একজন জোয়ান মাঝি ওর কামরায় ঢুকে হাত পায়ের বাঁধন কেটে দিলে।

তখনও পাশে কোথায় খুব হইচই হচ্ছে।

বিমল বললে–ব্যাপার কী বলো তো?আমার বন্ধুটি কোথায়?

মাঝি বললে–সে ভালোই আছে।

বলেই সে বাইরে চলে গেল। বেশি কথা বলে না এদেশের লোক।

বিমল তাড়াতাড়ি কামরার বাইরে এসে দেখলে সামনে এক অদ্‌ভুত ব্যাপার। নবাগত বোম্বেটে জাঙ্কখানা কঠিন প্রস্তরময় ডাঙায় ধাক্কা খেয়ে জখম হয়েছে। আর অল্প দূরেই সমুদ্রবক্ষে এমন একটা অদ্‌ভুত দৃশ্য দেখলে যা জীবনে কখনো দেখেনি।

আকাশ থেকে কালো মোটা থামের মতো একটা জিনিস নেমে সমুদ্রের জলে মিশে গিয়েছে –সে জিনিসটা আবার চলনশীল–হ্যাঁলকা রবারের বেলুন বা ফানুসের মতো অত বড়ো কালো মোটা থামটা বায়ুর গতির সঙ্গে ধীরে উত্তর থেকে দক্ষিণে ভেসে চলেছে।

এই সময় সুরেশ্বর ও জাঙ্কের সারেং এসে ওদের পাশে দাঁড়ালো।

সারেং বললে–উঃ কত বড়ো জোড়া জলস্তম্ভ, মিস্টার! চীন সমুদ্রে প্রায়ই জলস্তম্ভ হয় বটে কিন্তু এমন জোড়া জলস্তম্ভ আমি কখনো দেখিনি! ওই জলস্তম্ভটা আজ আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে।

ওই কালো মোটা থামের মতো ব্যাপারটা তাহলে জলস্তম্ভ। ছবিতে দেখেছে বটে। কিন্তু বিমল বা সুরেশ্বর জীবনে এই প্রথম জিনিসটা দেখলে।

কিন্তু ব্যাপারটা ওরা ঠিকমতো বুঝতে পারেনি। জলস্তম্ভ ওদের জীবন বাঁচাল কী করে?

বেশি দেরি হল না ব্যাপারটা বুঝতে। যখন ওরা দেখলে এই অল্প সময়ের মধ্যেই সুদক্ষ সারেং নোঙর উঠিয়ে জাঙ্কখানা ডাঙা থেকে প্রায় এক-শো গজ এনে ফেলেছে এবং প্রতিমুহূর্তেই তীর ও সমুদ্র উভয়ের ব্যবধান বাড়ছে। সারেং ও মাঝিদের মুখে শোনা গেল এই জলস্তম্ভের জোড়াটি দ্বীপের অদূরে ভেঙে গিয়ে বিপুল জলোচ্ছাসের সৃষ্টি করে–তাতে বোম্বেটেদের জাঙ্কখানাকে ঊর্ধ্বে উঠিয়ে সবেগে আছাড় মেরেছে ডাঙার গায়ে। জাঙ্কখানা জখম তো হয়েছেই এবং বোধ হচ্ছে ওদের কতকগুলি লোককেও ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মেরেছে।

সারেং বললে–জলস্তম্ভ ভয়ানক জিনিস, মিস্টার। অনেক সময় জাহাজ পর্যন্ত বিপদে পড়ে যায়–বড়ো বড়ো জাহাজ দূর থেকে কামান দেগে জলস্তম্ভ ভেঙে দেয়। আর বিশেষ করে এই চীন সমুদ্রে সপ্তাহে দু-একটা বালাই লেগেই আছে।

দ্বীপ ছেড়ে জাঙ্কটা বহুদূর চলে এসেছে।

আবার অকূল সমুদ্র!

বোম্বেটে জাহাজ ও জলস্তম্ভ স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গিয়েছে দিগন্তবিস্তৃত নীলিমার মধ্যে। সুরেশ্বর ও বিমল চুপ করে সমুদ্রের অপরূপ রঙের দিকে চেয়ে বসে আছে।

সারেং এসে বললে,–মিস্টার, আমরা হংকং থেকে আর বেশি দূরে নেই। কিন্তু হংকং যাব না।

সুরেশ্বর বললে- কোথায় যাব তবে?

হংকং থেকে পঞ্চাশ মাইল আন্দাজ দূরে ইয়ান-চাউ বলে একটা ছোটো দ্বীপ আছে। সেখানে আপনাদের নামিয়ে দেবার আদেশ আছে আমার ওপর। হংকং-এর কাছে গেলে ব্রিটিশ মানোয়ারী জাহাজ আমাদের নৌকো তল্লাসী করবে। তোমরা ধরা পড়ে যাবে মিস্টার!

পরদিন দুপুরের পরে ইয়ান-চাউ পৌঁছে গেল ওদের নৌকো। ক্ষুদ্র দ্বীপ। আগোগোড়া দ্বীপটি যেন একটা ছোটো পাহাড়, সমুদ্রের জল থেকে মাথা তুলে জেগে রয়েছে। এখানে চীন গভর্নমেন্টের একটা বেতারের স্টেশন আছে।

সমস্ত দ্বীপে আর কোনো অধিবাসী নেই। ওই বেতারের স্টেশনের জনকয়েক চীনা কর্মচারী ছাড়া।

দু-দিন ওরা সেখানে বেতারের আড্ডায় কর্মচারীদের অতিথি হয়ে রইল। তৃতীয় দিন খুব সকালে ক্ষুদ্র একখানা জাঙ্কে ওদের দশ মাইল দূরবর্তী উপকূলে নিয়ে যাওয়া হল।

বেতারে এইরকম আদেশই নাকি এসেছে।

এই চীন দেশ! যদি ঢেউ-খেলানো ছাদ-আঁটা চীনা বাড়ি না থাকত, তবে চীন দেশের প্রথম দৃশ্যটা বাংলা দেশের সাধারণ দৃশ্য থেকে পৃথক করে নেওয়া হঠাৎ যেত না।

উপকূল থেকে পাঁচমাইল দূরে রেলওয়ে স্টেশন। অতি প্রচন্ড কড়া রৌদ্রে পদ-ব্রজেই ওদের স্টেশনে আসতে হল। এদেশে ওদের জামাই-আদরে কেউ রাখবে না, কঠিন সামরিক জীবন যে এখন থেকেই শুরু হল ওদের–এ কথাটা সুরেশ্বর ও বিমল হাড়ে হাড়ে বুঝলে সেই ভীষণ রোদে বিশ্রী ধুলোভরা রাস্তা বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে।

তার ওপর বেতারের কর্মচারীটি ওদের সঙ্গে ছিল, তার মুখেই শোনা গেল এসব অঞ্চল আদৌ নিরাপদ নয়।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থার গন্ডগোলের সুযোগ নিয়ে চোর-ডাকাত ও গুন্ডার দল যা খুশি শুরু করেছে। তারা দিনদুপুরও মানে না। স্বদেশি-বিদেশিও মানে না। কারো ধন-প্রাণ নিরাপদ নয় আজকাল। দেশ এক প্রকার অরাজক।

শীঘ্রই এর একটা প্রমাণ পাওয়া গেল পথের মধ্যেই। ওরা একদলে আছে মাত্র চারজন। রৌদ্রে সুরেশ্বরের জল তেষ্টা পেয়েছিল–চীনা কর্মচারীটিকে ও ইংরেজিতে বললে–জল কোথাও পাওয়া যাবে?

রাস্তা থেকে কিছু দূরে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম বা বস্তি। খানকতক খড়ের ঘর একজায়গায় জড়ো করা মাত্র। চীনা কর্মচারীর পিছু পিছু ওরা সেই বস্তির দিকে গেল। বিমলের মনে হল একবার বৈদ্যবাটির গঙ্গার চরে সে তরমুজ কিনতে গিয়েছিল–এ ঠিক যেন বৈদ্যবাটীর চড়ার চাষি কৈবর্তদের গাঁ-খানা। একখানা গোরুরগাড়ি সামনেই ছিল–

তফাতের মধ্যে চোখে পড়ল সেটার গড়ন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। গোরুরগাড়ির অত মোটা চাকা বাংলা দেশে হয় না।

ওদের আসতে দেখেই কিন্তু বস্তির মধ্যে একটা ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি হল। মেয়ে-পুরুষ যে যার ঘর ছেড়ে ছুটে বেরোলো–এদিক-ওদিক দৌড় দিল। চীনা কর্মচারীও তৎপর কম নয়–সেও ছুটে গিয়ে একটি ধাবমানা স্ত্রীলোকের পথ আগলে দাঁড়াল।

স্ত্রীলোকটি দু-হাতে মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়ে জড়সড় হয়ে আর্তনাদ করে উঠল। ব্যাপারটা কী? সুরেশ্বর ও বিমল অবাক হয়ে গিয়েছে।

স্ত্রীলোকের বিপন্ন কণ্ঠের আর্তনাদ বিমল সহ্য করতে পারলে না। ও চেঁচিয়ে বললে–ওকে কিছু বোলো না, মি. চংপে–

ততক্ষণ ওদের সঙ্গী চীনা ভাষায় কী একটা বললে স্ত্রীলোকটিকে। কথাটা এইরকম শোনাল ওদের অনভ্যস্ত কানে।

হি চীন-কিচীন–চীন-চীন–

স্ত্রীলোকটি মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ওর দিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে বললে-ই-চীন, কি চীন, সি চীন–

–কী চীন, ফি চীন?

–সি চীন, লি চীন।

সুরেশ্বর ও বিমল ওদের কথা শুনে হেসেই খুন। কথাবার্তাগুলো যেন ওই রকমই শোনাচ্ছিল।

তারপর ওরা স্ত্রীলোকটির কাছে পায়ে পায়ে গেল। আহা, যেন মূর্তিমতী দারিদ্র্যের ছবি। ভারতবর্ষীয় লোকে তবুও স্নান করে, গায়-মাথায় তেল দেয়, ওরা তাও করে না–গায়ে খড়ি উঠছে, মাথা রুক্ষ, শরীর অন্নাভাবে শীর্ণ ও জ্যোতিহীন। হতভাগ্য মহাচীন, হতভাগ্য ভারতবর্ষ! দু-জনেই দরিদ্র, কেউ খেতে পায় না,–গুরু-শিষ্য দু-জনের অবস্থাই সমান।

বিমলের মনে মনে এই দরিদ্রা নারী, এই দরিদ্র, হতভাগ্য, উৎপীড়িত মহাচিনের এই ভয়ার্ত, অসহায় কুঁড়েঘরবাসী চাষিমজুর–এদের প্রতি একটা গভীর অনুকম্পা ও সহানুভূতি জাগল। মানুষ যখন দুঃখকষ্ট পায়, সবদেশে সর্বকালে তারা এক। চীন,

ভারতবর্ষ, রাশিয়া, আবিসিনিয়া, স্পেন, মেক্সিকো, এদের মধ্যে দেশের সীমা এখানে মুছে গিয়েছে।

এই অভাগিনী ভয়ব্যাকুলা দরিদ্র নারী সমগ্র চীনদেশের প্রতীক।

বিমল এসেছে এক হতভাগ্য দেশ থেকে–এই হতভাগ্য দেশকে সাহায্য করতে। সে তা যথাসাধ্য করবে। দরকার হলে বুকের রক্ত দিয়েও করবে।

www.bengaliebook.com

2.এরা ডাকাত নয়

স্ত্রীলোকটি যখন বুঝতে পারলে যে এরা ডাকাত নয় বা বিদ্রোহী রেড আর্মির লোকও নয়, তখন সে উঠে ঘরে গিয়ে জল নিয়ে এসে সবাইকে খাওয়ালে।

ধাতুপাত্র বা চীনা মাটির পাত্র নেই বাড়িতে, এত গরিব সাধারণ লোক। লাউয়ের খোােলায় জল রেখেছে।

চীনের বিশ্ববিখ্যাত মাটির বাসন, মিং রাজত্বের অপূর্ব প্রাচীন শিল্প, পুতুল, খেলনা, বুদ্ধ, দানব, এসব এই গরিবদের জন্যে নয়।

রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে খুব ভিড়। একখানা সৈন্যবাহী ট্রেন সিনকিউ থেকে সাংহাই যাচ্ছে –প্রত্যেক স্টেশনে আবার নতুন ভরতি-করা সৈন্যদের ওই ট্রেনেই উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সুরেশ্বর বিমলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ট্রেনের ছাদের দিকে।

সব কামরার ছাদে কাঁচা ডালপালা চাপানো–কোনোটায় শুকনো খড় বিচালি ছাওয়া।

বিমল বললে–এরোপ্লেন পাছে বোমা ফেলে ট্রেনে, তাই ওরকমকরেছে বলে মনে হয়।

সাংহাই ৪৫০ মাইল দূরে।

হঠর হঠর করে করে সারাদিন ট্রেন কৃষিক্ষেত্র, অনুচ্চ পাহাড়, গ্রাম আর বস্তি পার হয়ে চলেছে, চলেছে। ট্রেনের গতি মন্দ নয়, পুরোনো আমলের ইঞ্জিন বদলে নতুন ইঞ্জিন কেনা হয়েছে, বেশ জোরেই ট্রেন যাচ্ছে।

ওদের কামরাতে সাধারণ সৈন্যদল নেই অবিশ্যি। মাত্র জন্য আষ্টেক লোক, সবাই অফিসার শ্রেণির, কিন্তু কেউ ইংরেজি জানে না। মহা অসুবিধেয় পড়ে গেল ওরা–কিছু দরকার হলে চাওয়া যায় না, নতুন কিছু দেখলে জিজ্ঞেস করা যায় না যে সেটা কী।

দুপুরের দিকে একটা ছোটো শহরে গাড়ি দাঁড়াল এবং ওদের কামরাতে একজনসাদা সরু একগুচ্ছ লম্বা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ সৌম্যমূর্তি ভদ্রলোক উঠলেন, সঙ্গে তাঁর এগারোটি তরুণ যুবা। এদের সবারই বেশ সুন্দর কমনীয় চেহারা।

বিমল বললে–গুড মর্নিং স্যার।

বৃদ্ধের মুখ দেখে মনে হয় জগতে তাঁর আপন-পর কেউ নেই। তিনি সবাইয়ের ওপর সন্তুষ্ট, জীবনে সবাইকে ভালোবেসেছেন।

তিনি হাসিমুখে ইংরেজিতে বললেন–গুড মর্নিং, আপনারা কোথায় যাবেন।

বিমল বললে–সাংহাই। আপনারা কী অনেকদূর যাবেন?

আমরা যাচ্ছি সাংহাই। আমি এখানকার কলেজের প্রোফেসর। আমার নাম লি। আমি সেখানে যাচ্ছি, যুদ্ধের সময়কার মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে। এদেরও নিয়ে যাচ্ছি, এরা সবাই আমার ছাত্র। সদানন্দ বৃদ্ধ কথা শেষ করে গর্বিত দৃষ্টিতে তাঁর এগারোটি তরুণ ছাত্রের দিকে চাইলেন। বিমল ও সুরেশ্বরের বড়ো অদ্ভুত মনে হল। এই ভয়ানক দিনে ইনি মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে চলেছেন সাংহাইতে, এতগুলি বালকের জীবন বিপন্ন করে।

একটু পরে বৃদ্ধের একটি ছাত্র একটি বেতের বাক্স থেকে কীসব খাবার বার করে সবাইকে খেতে দিলে। বৃদ্ধ সুরেশ্বর ও বিমলকেও তাঁদের সঙ্গে খেতে আহ্বান করলেন।

সুরেশ্বর নিম্নস্বরে বললে–খেয়ে না বিমল। ইঁদুর ভাজা কিংবা আরশোলা চচ্চড়ি বোধ হয়।

কিন্তু সেসব কিছু নয়। শরবতি লেবুর রস দেওয়া কুমড়োর বিচি ভাজা আর শসার আচার।

বিমল বললে, প্রোফেসর লি, আপনি সাংহাইতে কোথায় উঠবেন। আমাদের সঙ্গে থাকুন না, আমরা যেখানে থাকব? হঠাৎ এরোপ্লেনের আওয়াজ কানে গেল–গাড়িসুদ্ধ সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে জানালার কাছে গিয়ে আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখবার চেষ্টা করলে কোনদিক থেকে আওয়াজটা আসছে।

ছ-খানা এরোপ্লেন সারবন্দি হয়ে উড়ে পুব থেকে পশ্চিমের দিকে আসছে। ট্রেনখানার বেগ হঠাৎ বড়ো বেড়ে গেল। সকলেই উদবিগ্ন হয়ে পড়েছে, পরস্পরের মুখের দিকে চাইছে। কিন্তু এরোপ্লেনের সারি ট্রেনের ঠিক ওপর দিয়েই উড়ে চলে গেল শান্তভাবেই।

প্রোফেসর লি দিব্যি নির্বিকার ভাবেই বসেছিলেন। তিনি বললেন–আমাদের গভর্নমেন্টের এরোপ্লেন।

একটা স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম থেকে নারীকণ্ঠের কান্না শুনে বিমল ও সুরেশ্বর মুখ বাড়িয়ে দেখলে, কতকগুলি সৈন্য একটি দরিদ্রা স্ত্রীলোকের চারিধারে ঘিরে হাসছে–স্ত্রীলোকটির সামনে একটা শূন্য ফলের ঝুড়ি–এদিকে সৈন্যদের প্রত্যেকের হাতে এক-একটা খরমুজ।

বিমল বললে–প্রোফেসর লি, আমরা তো নতুন দেশে এসেছি, কিছু বুঝিনে এদেশের ভাষা। বোধ হয় খরমুজওয়ালির সব ফল এরা কেড়ে নিয়ে দাম দিচ্ছে না। আপনি একবার দেখুন না।

বৃদ্ধ তাঁর এগারোটি ছাত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বাধা দিলেন সৈন্যদের। চীনা ভাষায় তুবড়ি ছুটল উভয় পক্ষেই।

বৃদ্ধের ছাত্রগণও তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দরকার হলে মারামারি করবে। মারামারি একটা ঘটত হয়তো, কিন্তু সেই সময় জনৈক চীনা সামরিক অফিসার গোলমাল দেখে সেখানে উপস্থিত হতেই সৈন্যরা খরমুজ রেখে যে যার কামরায় উঠে বসলে। খরমুজওয়ালি গোটাকতক ফল লি ও তাঁর ছাত্রদের খেতে দিলে–বৃদ্ধ তার দাম দিয়ে দিলেন, খরমুজওয়ালির প্রতিবাদ শুনলেন না।

সন্ধ্যার সময় ট্রেন ফু-চু পোঁছোলো।

ফু-চু থেকে অনেকগুলি সৈন্য উঠল। ট্রেন কিন্তু ছাড়তে চায় না–খবর পাওয়া গেল, সামনের রেলপথে কী একটা গোলমালের দরুন ট্রেন ছাড়বার আদেশ নেই।

এ দেশে সময়ের কোনো মূল্য নেই। চার-পাঁচ ঘণ্টা ওদের ট্রেনখানা প্ল্যাটফর্মের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। সৈন্যদল নেমে যে-যার খুশিমতো স্টেশনে পায়চারি করছে, তারের বেড়া ডিঙিয়ে ওপাশের বাজারের মধ্যে ঢুকে হল্লা করছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে বেড়াচ্ছে।

একটা ছোটো ছেলে তারের একরকম যন্ত্র বাজিয়ে গাড়িতে গাড়িতে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছিল। প্রোফেসর লি তাকে ডেকে কী জিজ্ঞেস করলেন, তাকে কিছু খাবার দিলেন। তাঁরই মুখে বিমল ও সুরেশ্বর শুনলে ছেলেটি অনাথ, স্থানীয় আমেরিকান মিশনে প্রতিপালিত হয়েছিল–এখন সেখানে আর থাকে না।

সন্ধ্যার আগে ট্রেন ছাড়ল। সারারাতের মধ্যে যে কত স্টেশন পার হল, কত স্টেশনে বিনা কারণে কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইল–তার লেখাজোখা নেই। এইরকম ধরনের রেলভ্রমণ বিমল ও সুরেশ্বর কখনো করেনি।

ভোরের দিকে ট্রেনখানা একজায়গায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিমল ঘুমোচ্ছিল–ঝাঁকুনি খেয়ে ট্রেনখানা দাঁড়াতেই ওর ঘুম ভেঙে গেল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিমল দেখলে দু-ধারের মাঠে ঘন কুয়াশা হয়েছে, দশহাত দূরের জিনিস দেখা যায় না–সামনের দিকে লাইনের ওপর আর একখানা ট্রেন যেন দাঁড়িয়ে–কুয়াশায় তার পেছনের গাড়ির লাল আলো ক্ষীণভাবে জ্বলছে।

প্রোফেসর লি-ও ইতিমধ্যে উঠেছেন।

তিনি বললেন–ব্যাপারটা কী?

বিমল বললে–সামনে দু-খানা ট্রেন দাঁড়িয়ে এই তো দেখছি। ঘোর কুয়াশা, বিশেষ কিছু দেখা যায় না।

ট্রেন থেকে লোকজন নেমে দেখতে গেল সামনের দিকে এগিয়ে। খুব একটা গোলমাল যেন শোনা যাচ্ছে সামনে।

সুরেশ্বরও উঠেছিল, বললে–চলো বিমল, এগিয়ে দেখে আসি।

প্রোফেসর লি-ও নামলেন ওদের সঙ্গে। দু-খানা ট্রেনকে ঘন কুয়াশার মধ্যে অতিক্রম করে রেললাইনের সামনে গিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়ল তা যেমন বীভৎস, তেমনি করুণ।

সেখানে আর একখানা ছোটো সৈন্যবাহী ট্রেন দাঁড়িয়ে–কিন্তু বর্তমানে সেখানাকে ট্রেন বলে চিনে নেওয়ার উপায় নেই বললেই হয়। ছাদ উড়ে গিয়েছে, মোটা মোটা লোহার দন্ড বেঁকে দুমড়ে লাইনের পাশের খাদে ছিটকে পড়েছে–জানলা-দরজার চিহ্ন বড়ো একটা নেই। কেবল ইঞ্জিনের কিছু হয়নি। শোনা গেল ট্রেনখানার ওপর বোমা পড়েছে এই কিছুক্ষণ আগে–কিন্তু সুখের বিষয় গাড়িখানা একদম খালি যাচ্ছিল। এখানা কোনো টাইমটেবলভুক্ত যাত্রী বা সৈন্যবাহী ট্রেন নয়। খালি ট্রেনখানা ফু-চু থেকে সাংহাই যাচ্ছিল, ডাউন লাইনে বড়োগাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে এর কামরাগুলি এই উদ্দেশ্যে। গার্ড ও ড্রাইভার বেঁচে গিয়েছে। কোনো প্রাণহানি হয়নি।

লাইন পরিষ্কার করতে বেলা এগারোটা বেজে গেল। মাত্র পনেরো মাইল দূরে সাংহাই, সেখানে পৌঁছোতে বেজে গেল একটা।

সাংহাই নেমে বিমল ও সুরেশ্বর বুঝলে এ অতি বৃহৎ শহর; সাংহাই-এর রাস্তাঘাট খুব চওড়া ও আধুনিক ধরনে তৈরি, বড়ো বড়ো বাড়ি, দোকান, হোটেল, অফিস, স্কুল, কলেজ–চীনা ও ইংরেজি ভাষায় নানা সাইনবোর্ড চারিদিকে, মোটরের ও রিকশা-গাড়ির ভিড়, রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য, চায়ের দোকান, চীনা ভাতের দোকানে ছোটো-বড়ো ইঁদুর ভাজা ঝোলানো রয়েছে, ফলওয়ালি রাস্তার ধারে বসে ফল বিক্রি করছে–এত বড়ো শহরের লোকজন ও ব্যাবসাবাণিজ্য দেখলে কেউ বলতে পারবে না যে এই সাংহাই শহরের ওপর বর্তমানে জাপানি সৈন্যবাহিনী আক্রমণ করতে আসছে পিকিং থেকে।

কিছু বদলায়নি যেন, মনে হয় প্রতিদিনের জীবনযাত্রা সহজ ও উদবেগ শূন্য ভাবেই চলেছে।

এখানে প্রোফেসর লি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। খুব বড়ো ধূসর রংয়ের সামরিক লরিতে চড়ে ওরা একটা বড়ো লম্বামতো বাড়ির সামনে নীত হল।

বাড়িটা সামরিক বিভাগের একটা বড়ো দপ্তরখানা, এ ওদের বুঝতে দেরি হল না–ইউনিফর্ম পরা সৈন্যদল ও অফিসারে ভরতি। প্রতি কামরায় চীনা ভাষায় সাইনবোর্ড আঁটা। অফিসার দল ঢুকছে-বেরোচ্ছে, সকলের মুখেই ব্যস্ততার ভাব, উদবেগের চিহ্ন।

দু-তিন জায়গায় ওদের নাম লেখা হল–ওদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে যে চীনা অফিসার, সে প্রত্যেক জায়গায় একটা লম্বা হলদে চীনা ভাষায় লিখিত কাগজ খুলে ধরলে টেবিলের ওপর।

তবুও আইনকানুন শেষ হল না–অবশেষে একটা কামরার সামনে ওদের দাঁড় করালে। কামরার মধ্যে নিশ্চয় কোনো বড়ো কর্মচারীর আড্ডা, কারণ কামরার সামনে দর্শনপ্রার্থী সামরিক অফিসার ও অন্যান্য লোকের ভিড় লেগেছে।

ভিড় ঠেলে একটু কাছে গিয়ে বিমল পড়লে দরজার গায়ে পিতলের ফলকে ইংরেজিতে লেখা আছে–জেনারেল চু-সিন-টে, অফিসার কমাণ্ডিং, নাইনটিনথ রুট আর্মি। ওদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি–জেনারেল সাহেবের কামরায় শীঘ্রই ডাক পড়ল। বড়ো টেবিলের ওপাশে এক সুশ্রী, সামরিক ইউনিফর্ম পরিহিত যুবা বসে, ইনিই জেনারেল চু-টে, পূর্বে বিদ্রোহী কমিউনিস্ট সৈন্যদলের নেতা ছিলেন, বর্তমানে জেনারেল চিয়াং-কাই-শেক-এর বিশিষ্ট সহকর্মী।

হাসিমুখে জেনারেল চু-টে মার্জিত ইংরেজিতে বললেন, গুড মর্নিং, আপনাদের কোনো কষ্ট হয়নি পথে?

এরাও হাসিমুখে কিছু সৌজন্যসূচক কথা বললে।

জেনারেল চুটে বললেন–আমি ভারতবর্ষের লোকদের বড়ো ভালোবাসি। আপনারা আমাদের পর নন।

বিমল বললে–আমরাও তাই ভাবি।

–মহাত্মা গান্ধী কেমন আছেন? ওই একজন মস্ত লোক আপনাদের দেশের!

জেনারেল চু-টে-র মুখে মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনে বিমল ও সুরেশ্বর দু-জনেই আশ্চর্য হয়ে গেল। তবে মহাত্মা গান্ধী তো আর ওদের বাড়ির পাশের প্রতিবেশী ছিলেন না, সুতরাং তাঁর দৈনন্দিন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ওদের কোনো জ্ঞান নেই–তার ওপর ওরা আজ দু-মাস দেশ ছাড়া।

–ভালোই আছেন। ধন্যবাদ

–মি. জহরলাল নেহেরু ভালো আছেন? আমি তাঁকে শিগগির একটা চিঠি লিখছি। আমাদের দেশের জন্য ভারতের সাহায্য, কংগ্রেসের সাহায্য চেয়ে।

বিমল ও সুরেশ্বরের বুক গর্বে ফুলে উঠল। একজন স্বাধীন দেশের বীর সেনানায়কের মুখে তাদের দরিদ্র ভারতের নেতাদের কথা শুনে চীনদেশ ভারতের কাছে সাহায্যপ্রার্থী একথা শুনে ওরা যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছে।

জেনারেল চুটে বললেন–আমার এক সময় অত্যন্ত ইচ্ছে ছিল ভারতে বেড়াতে যাব। নানা কারণে হয়ে ওঠেনি। ভারতে ভালো বৈমানিক তৈরি হচ্ছে? এরোপ্লেন চালাবার ভালো স্কুল কোথায় স্থাপিত হয়েছে?

বিমলেরা এ খবর রাখে না। দমদমায় একটা যেন ওই ধরনের কিছু আছে–তবে তার বিশেষ কোনো বিবরণ ওরা জানে না।

চুটে বললেন–আপনাদের ধন্যবাদ, এদেশকে আপনারা সাহায্য করতে এসেছেন। আপনাদের ঋণ কখনো চীন শোধ দিতে পারবে না। আপনারা পথ দেখিয়েছেন। আপনাদের প্রদর্শিত পথে দুই দেশের মিলন আরও সহজ হোক এই কামনা করি।

বিমল বললে–এখন কি আমাদের সাংহাইতে থাকতে হবে?

কিছুদিন। বৈদেশিক মেডিকেল ইউনিটে আমেরিকান ডাক্তার ব্‌লুমফিল্ডের অধীনে। এখন আপনাদের থাকতে হবে মার্কিন কনসেশনে–সাধারণ শহরে নয় আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে চীন গভর্নমেন্ট আপনাদের জীবনের জন্য দায়ী। সাধারণ শহরে বোমা পড়বে, হাতাহাতি যুদ্ধ হবে–এখানে কারো জীবন নিরাপদ নয়। আন্তর্জাতিক কনসেশনে আমরা হাসপাতাল খুলেছি। সেখানে আপনারা কাজ করবেন।

ইওর এক্সেলেন্সি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, যদি বেয়াদবি না হয়!

বলুন?

সাংহাই কি জাপানিরা আক্রমণ করবে বলে আপনি ভাবেন?

জেনারেল চুটে বললেন–এ তো আন্দাজের কথা নয়–সাংহাই-এর দিকেই তো ওরা পিকিং থেকে আসছে। সেনসি হচ্ছে লুংহাউ রেলের শেষপ্রান্ত। সেখানে আমরা সৈন্য জড়ো করছি ওদের বাধা দিতে। যাতে উত্তর-পশ্চিম চীনে আর না এগোতে পারে। তবে সাংহাইতে একটা বড়ো যুদ্ধ হবে অল্পদিনের মধ্যেই। মেডিকেল ইউনিটের আরও সেইজন্যে সাংহাইতেই এখন দরকার।

সুরেশ্বর ও বিমল অভিবাদন করে বিদায় নিলে।

সৈন্যবিভাগের দপ্তরখানা থেকে বার হয়ে ওরা মোটরে চড়ে আন্তর্জাতিক কনসেশনে পৌঁছোলো। বিমল ও সুরেশ্বর লক্ষ করলে ব্রিটিশ প্রজা হলেও ওদের ব্রিটিশ কনসেশনে না নিয়ে গিয়ে ফরাসি কনসেশনে নিয়ে যাওয়া হল! ওদের সঙ্গে দু-জন চীনা সামরিক কর্মচারী ছিল, আবশ্যকীয় কাগজপত্র তারাই দেখালে বা সই করলে।

প্রকান্ড ব্যারাক। কড়া সামরিক আইনকানুন। হুকুম না নিয়ে কনসেশনের সীমার বাইরে যাবার নিয়ম নেই, ঢোকবারও নিয়ম নেই। ফরাসি সান্ত্রী রাইফেল হাতে সর্বদা পাহারা দিচ্ছে। ফরাসি জাতীয় পতাকা উড়ছে ব্যারাকের পতাকা মন্দিরে। ওদের যাবার দু-দিন পরে একদল আমেরিকান যুবক কনসেশনে এসে পৌঁছোলো–এরা বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এসেছে চীন গভর্নমেন্টকে সাহায্য করতে, নিজেদের সুখসুবিধা বিসর্জন দিয়ে, প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন করে। এদের মধ্যে তিনটি তরুণী ছাত্রীও ছিল, এরা এল সেদিন সন্ধ্যাবেলা। এদের কনসেশনে ঢোকানো নিয়ে চীনা গভর্নমেন্টকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

একটি মেয়ের নাম অ্যালিস ই. হুইটবার্ন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। বিমলের সঙ্গে সে যেচে আলাপ করলে। যেমনি সুশ্রী তেমনি অদ্ভুত ধরনের প্রাণবন্ত, সজীব মেয়ে। কুড়ি-একুশ বয়েস–চোখেমুখে বুদ্ধির কী দীপ্তি!

বিমল তাকে বললে–মিস হুইটবার্ন, তুমি ডাক্তারির ছাত্রী ছিলে?

মেয়েটি বললে–না! আমি নার্স হব আন্তর্জাতিক রেডক্রসে কিংবা চীনা সামরিক বিভাগের হাসপাতালে।

তোমার বাপ-মা আছেন?

আছেন। আমার বাবা ঘোড়ার শিক্ষক। খুব নামকরা লোক আমাদের কাউন্টিতে।

তাঁরা তোমাকে ছেড়ে দিলেন?

তাঁদের বুঝিয়ে বললাম। জগতের এক হতভাগা জাতি যখন এত দুর্দশা ভোগ করছে, তখন পড়াশুনো বা বিলাসিতা কি ভালো লাগে? আমি আমার সেন্ট আর পাউডারের টাকা জমিয়ে, টকির পয়সা জমিয়ে, পাঠিয়ে দিয়েছিলাম এদের সাহায্যের জন্যে মার্কিন রেডক্রস ফাণ্ডে। তারপর নিজেই না এসে পারলুম না–তুমিই বলো না মি. বোস পারা যায় থাকতে?

বিমল মুগ্ধ হয়ে গেল এই বিদেশিনি বালিকার হৃদয়ের উদারতার পরিচয় পেয়ে। স্বাধীন দেশের মেয়ে বটে! সংস্কারের পুঁটুলি নয়।

মেয়েটা বললে–আমাকে এ্যালিস বলে ডেকো। একসঙ্গে কাজ করব, অত আড়ষ্ট ভদ্রতার দরকার নেই। আমার একখানা ফোটো দেব তোমায়, চলো তুলিয়ে আনি দোকান থেকে।

কনসেশনের মধ্যে প্রায়ই সব আমেরিকান দোকান। মেয়েটি বললে, চলো সাংহাই শহরের মধ্যে একটু বেড়িয়ে আসি–কোনো চীনা দোকানে ফোটো তুলব। ওরা দু-পয়সা পাবে।

অনুমতি নিয়ে আসতে আধঘণ্টা কেটে গেল, তারপর বিমল আর এ্যালিস কনসেশনের বড়ো ফটক দিয়ে সাংহাইয়ে যাবার রাস্তার ওপরে উঠে একখানা রিকশা ভাড়া করলে।

কনসেশনে রাস্তাঘাটের নাম ইংরাজিতে ও ফরাসি ভাষায়। সাংহাই শহরে চীনা ভাষায়। কিছু বোঝা যায় না। ঢলঢলে নীল ইজের ও স্ট্র হ্যাট পরে চীনা রিকশাওয়ালা রিকশা টানছে কিন্তু এ অংশেও বহু বিদেশি লোক ও বিদেশি দোকান পসারের সারি। সাংহাই-এর আসল চীনাপল্লি আলাদা–রাস্তা সেখানে আরও সরু সরু–একথা বিমল ইতিমধ্যে চীনা অফিসারদের মধ্যে শুনেছিল।

এ্যালিস বললে–চলো, চীনাপাড়া দেখে আসি, মি. বোস।

রিকশাওয়ালাকে চীনাপাড়ার কথা বলতেই সে বারণ করলে। বললে– সেখানে কেন যাবে। এ সময় সেসব জায়গা ভালো না। বিপদে পড়তে পার। তোমাদের সেখানে নিয়ে গেলে আমায় পুলিশে ধরবে।

এ্যালিস ভয় পাবার মেয়েই নয়। বললে–চলো, মি. বোস, আমরা হেঁটেই যাব। ওকে বিপদে ফেলতে চাই নে। ওর ভাড়া মিটিয়ে দিই।

বিমল রিকশাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে দিলে, এ্যালিসকে দিতে দিলে না। কিন্তু রাস্তা দু-জনে কেউই জানে না।

বিমল বললে–একখানা ট্যাক্সি নিই, এ্যালিস! সে অনেকদূর, রাস্তা না জানলে ঘুরে হয়রান হব।

হঠাৎ এ্যালিস ওপরের দিকে চেয়ে বললে–ও কি ও, মি. বোস? এরোপ্লেনের শব্দ শুনছ? অনেকগুলো এরোপ্লেন একসঙ্গে আসছে যেন। কোনদিকে বলো তো?

বিমলও শুনলে। বললে–গভর্নমেন্টের এরোপ্লেন।

কিন্তু চক্ষের নিমেষে একটা কান্ডের সূত্রপাত হল, যা বিমলের অভিজ্ঞতার বাইরে।

সামনে একটা প্রকান্ড বাড়ির ওপর বিকট এক আওয়াজ হল–বাজপড়ার আওয়াজের মতো–সঙ্গেসঙ্গে এদিকে-ওদিকে, সামনে-পেছনে পরপর সেইরকম ভীষণ আওয়াজ। ইট, চুন, টালি চারিদিকে ছুটতে লাগাল। বিরাট শব্দ করে সামনে সেই বাড়িটার তেতলার ছাদ ধসে পড়ল ফুটপাথের ওপর। বাড়িধসা চুন সুরকির ধুলোয় ও কীসের ঘন শ্বাসরোধকারী ধোঁয়ায় বিমল ও এ্যালিসকে ঘিরে ফেললে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠল মানুষের গলার আর্ত চিৎকার, গোলমাল, গোঙানি, কাতর কাকুতি অনুনয়ের শব্দ, দুড়দাড় শব্দে ছুটে চলার পায়ের শব্দ, কান্নার শব্দ, সে এক ভয়ানক কান্ড!

বিমল প্রথমটা বুঝতে না পেরে সেই ঘন ধূম আর ধূলির মধ্যে হতভম্বের মতো খানিক দাঁড়িয়ে রইল–ব্যাপার কী? তারপরেই বিদ্যুৎ চমকের মতো তার মনে হল এ জাপানি এরোপ্লেনের বোমা বর্ষণ!

এ্যালিস কই? একহাতের দূরের মানুষ চোখে পড়ে না, সেই ধোঁয়া ধুলো আর গোলমালের মধ্যে। ওর কানে গেল এ্যালিসের উচ্চ ও সশঙ্ক কণ্ঠস্বর–মি. বোস, এসো–আমার হাত ধরো–বোমা পড়ছে–দৌড় দাও!

অন্ধকারের মধ্যে বিমল এ্যালিসের হাত শক্ত মুঠোয় ধরে বললে– কোথাও নোড়ো না এ্যালিস, নড়লেই মারা যাবে। দাঁড়াও এখানে।

কিন্তু তখন আর ছোটবার বা পালাবার পথও নেই। পরবর্তী পাঁচ মিনিট কালের ঠিক হিসেব বিমল দিতে পারবে না। সে নিজেও জানে না। বাঁশঝাড়ে আগুন লাগলে যেমন গাঁটওয়ালা বাঁশ ফটফট করে একটার পর একটা ফাটে তেমনি চারিদিকে দুমদাম শুধু বোমা ফাটার বিকট আওয়াজ।

পায়ের তলায় মাটি যেন দুলছে, টলছে ভূমিকম্পের মতো ধোঁয়া, বাড়ি ধসে পড়ার হুড়মুড় শব্দ, আর্তনাদ–তারপরে সব চুপচাপ, বোমার আওয়াজ থেমে গেল। বিমল চেয়ে দেখলে এরোপ্লেনগুলো মাথার ওপরে চক্রাকারে দু-বার ঘুরে যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে চলে গেল–বেশ যেন নিরুপদ্রব, শান্ত ভাবেই।

ধোঁয়ায় মিনিট দুই তিন কিছু দেখা গেল না–যদিও গোলমাল, চিৎকার লোক জড়ো হওয়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। পুলিশের তীব্র হুইসল বেজে উঠল একবার–দু-বার, তিনবার।

ক্রমে ক্রমে ধুলো আর ধোঁয়ার আবরণ কেটে যেতেই এ্যালিস বললে–চলো এগিয়ে গিয়ে দেখি, মি. বোস—

সামনে একজায়গায় ফুটপাথের ওপর বেজায় লোক জড়ো হয়েছে। একটা বাড়ি পড়েছে ভেঙে। অতি বীভৎস দৃশ্য ফুটপাথের ওপর। অনেকগুলি ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়ের ছিন্ন ভিন্ন দেহ ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে আছে সেখানটায়! বাড়িটা বোধ হয় একটা চীনা স্কুল ছিল– বেলা এগারোটা, ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছিল, কতক ছিল স্কুলবাড়ির মধ্যে। বাড়িখানা একেবারে হুমড়ি খেয়ে ভেঙে পড়েছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ফুটপাথ ও রাস্তার খানিকদূর পর্যন্ত।

হর্ন বাজিয়ে দু-খানা রেডক্রশ অ্যাম্বুলেন্স এল! একটা ছোটো ছেলে এখনও নড়ছে– এ্যালিস ছুটে তার পাশে গিয়ে বসল। বিমল এক চমক দেখেই বললে– কোনো আশা নেই মিস হুইটবার্ন–ও এখুনি যাবে।

বিমলের গা তখনও কাঁপছে। জীবনে এ-রকম দৃশ্য কখনো দেখবার কল্পনাও সে করেনি। যুদ্ধ না শিশুপাল বধ!

এ্যালিস-বিমলের কাজ অনেক সংক্ষেপে হয়ে গিয়েছিল।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আহত কেউ ছিল না–সবাই মৃত।

সব শেষ হয়ে যাবার পরে বিমল বললে–এ্যালিস, এখন কী করবে? আর কি চীনে পল্লিতে যাবে এখন?

এ্যালিস বললে–যেতাম কিন্তু এই যে বোমা ফেলা হয়ে গেল, এর শোরগোল অনেকদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে তো। কনসেশনের সবাই আমাদের জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়বে। সুতরাং চলো ফেরা যাক। কিছুদূরে যেতেই দেখলে হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স ছুটোছুটি করছে। চীনা গভর্নমেন্টের অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট কামানগুলি চারদিক থেকে ছোঁড়া হতে লাগল–কিন্তু তখন জাপানি বিমান কোথায়? আকাশের কোনো দিকেই তার পাত্তা নেই।

ওরা কনসেশনে ফিরে এল। সুরেশ্বরের কাছে বিমল খুব বকুনি খেল, তাকে ফেলে যাওয়ার জন্যে।

এ্যালিস বললে–ওকে বকছ কেন–আমি ভেবেছি আজ বিকেলে আবার চীনাপাড়ায় যাবার চেষ্টা করব। তুমি চল না, সুরেশ্বর।

এবার ওদের সঙ্গে আর একটি মেয়ে যাবে বললে। এ্যালিসের সঙ্গে পড়ত, নাম তার মিনি –মিনি বেরিংটন।

বিকেলে ওরা ট্যাক্সি আনালে। ওদের ট্যাক্সি কনসেশনের গেট পর্যন্ত এসেছে–এমন সময় একজন তরুণ চীনা সামরিক কর্মচারী ওদের ট্যাক্সিখানা থামালো।

বললে–আপনারা কোথায় যাবেন?

বিমল বললে–শহর বেড়াতে।

যাবেন না। আমরা গুপ্ত খবর পেয়েছি, জাপানি যুদ্ধজাহাজ বন্দরের বাইরের সমুদ্র থেকে লম্বা পাল্লার কামানে গোলাবর্ষণ শুরু করবে আজ সন্ধ্যার সময়ে–সেই সঙ্গে জাপানি উড়ো জাহাজও যোগ দেবে বোমা ফেলতে।

ধন্যবাদ। আমরা একটু ঘুরে এখুনি চলে আসব।

একথা বললে এ্যালিস–কাজেই বিমল বা সুরেশ্বর কিছু বলতে পারলে না। শহরের মধ্যে এসে দেখলে, পুলিশ সকলের হাতে চীনা ভাষায় মুদ্রিত এক এক টুকরো কাগজ বিলি করছে। চীনা ছাত্রদের একটা লম্বা দল পতাকা উড়িয়ে মুখে কী বলতে বলতে শোভাযাত্রা করে চলেছে।

সাংহাই অতিপ্রকান্ড শহর। এত বড়ো শহর বিমল দেখেনি–সুরেশ্বরও না। কলকাতা এর কাছে লাগেই না।

চীনাপল্লির নাম চা-পেই। সে-জায়গাটায় রাস্তাঘাট কিন্তু অপরিসর নয়—তবে বড়ো ঘিঞ্জি বসতি। প্রত্যেক মোড়ে খাবারের দোকান, ছোটো-বড়ো হঁদুর ভাজা ঝুলছে। বাঁকে করে ফিরিওয়ালা ভাত-তরকারি বিক্রি করছে।

বিমলের ভারি ভালো লাগল এই চীনাপাড়ার জীবনস্রোত। এক জায়গায় একটা বুড়ি বসে ভিক্ষে করছে—টাকাপয়সার বদলে সে পেয়েছে ভাত-তরকারি, ওর মুখে এমন একটি উদার ভালোবাসার ভাব, চোখে সন্তোষ ও তৃপ্তির দৃষ্টি। বোধ হয় আশাতীত ভাত-তরকারি পেয়েছে। বলে এত খুশি হয়ে উঠেছে মনে মনে। প্রাচ্য-ভূখণ্ডের দারিদ্র্য ও সহজ-সরল সন্তোষের ছবি যেন এই বৃদ্ধা ভিখারিনির মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

হঠাৎ আকাশে কী একটা অদ্‌ভুত ধরনের শব্দ শুনে ওরা মুখ তুলে চাইলে। একটা চাপা সোঁ-ও-ও শব্দ। মিনি সর্বপ্রথমে বলে উঠল—এ শেলের শব্দ! সর্বনাশ, এ্যালিস, চলো আমরা ফিরি—জাপানি যুদ্ধজাহাজের কামান থেকে শেল ছুড়ছে! দুম! দুম!—দূরে অস্পষ্ট কামানের আওয়াজ শোনা গেল।

কাছেই কোথায় একটা ভীষণ বিস্ফোরণের আওয়াজ হল সঙ্গেসঙ্গে। লোকজন চারিধারে ছুটতে লাগল—ওরাও ছুটল তাদের পিছু পিছু। বসতি যেখানে খুব ঘিঞ্জি, সেখানে একটা বাড়িতে গোলা পড়েছে। বাড়িটার সামনের অংশ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে—ইট, চুন, টালিতে সামনের রাস্তাটা প্রায় বন্ধ—কে মরেছে না মরেছে বোঝা যাচ্ছে না, সেখানে লোকজনের বেজায় ভিড়।

আবার সেই রকম সোঁ—সোঁ–ও–ও শব্দ!

কাছেই আর একটা জায়গায় গোলা পড়ল। সঙ্গেসঙ্গে আকাশে সারবন্দি একদল এরোপ্লেন দেখা গেল। তারা অনেক উঁচু দিয়ে যাচ্ছে, পাছে চীনা বিমানধ্বংসী কামানের গোলা খেতে হয় এই ভয়ে।

এ্যালিস বললে—ওরা পাল্লা ঠিক করে দিচ্ছে যুদ্ধজাহাজের গোলন্দাজদের। চলো এখানে আর থাকা নয়—এই চীনা পাড়াটা ওদের লক্ষ।

কিন্তু ওদের যাওয়া হল না। এ্যালিসের কথা শেষ হতে-না-হতেই, যেন একটা ভীষণ ভূমিকম্পে, পায়ের তলায় মাটি দুলে উঠল এবং একসঙ্গে দু-তিনটি শেলের বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ ও সেই সঙ্গে প্রচুর ধোঁয়া ও বিশ্রী শ্বাসরোধকারী কর্ডাইট-এর উগ্র গন্ধ পাওয়া গেল। তুমুল হইচই, আর্তনাদ, কলরব ও পুলিশের হুইসলের মাঝে এ্যালিসের হাত ধরলে বিমল, মিনির হাত ধরলে সুরেশ্বর, কিন্তু পালাবার পথ নেই

তখন কোনো দিকেই। ওদের ট্যাক্সিখানা দাঁড়িয়ে আছে বটে, ট্যাক্সিওয়ালার সন্ধান নেই– সে বোধ হয় পালিয়েছে।

চা-পেই পল্লির ওপর কেন বিশেষ লক্ষ জাপানি তোপের, একথা বোঝা গেল না, কারণ এখানে চীনা গৃহস্থদের বাড়িঘর মাত্র, কোনো সামরিক ঘাঁটি তো নেই এখানে। দেখতে দেখতে বাড়িঘর ভেঙে গুড়ো হয়ে পড়ে সামনের-পেছনের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। লোকজন আগে যা কিছু মারা পড়েছিল–এখন সবাই পালিয়েছে, কেবল যারা ভাঙাবাড়ির মধ্যে আটকে পড়েছে তাদেরই আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে।

একটা ভগ্নস্তূপের মধ্যে যেন ছোটো ছেলের কান্নার শব্দ। এ্যালিস বললে–দাঁড়াও বিমল –এখানে সবাই দাঁড়াও।

গোলাবর্ষণ তখনও চলছে, কিন্তু চীনাপল্লির অন্য অঞ্চলে। এদিকে এখন শুধু গোঙানি, চিৎকার, হইচই কলরব ও কাতরোক্তি।

এ্যালিস আগে চড়ল গিয়ে ধ্বংসস্তূপের ওপরে। পেছনে মিনি ও সুরেশ্বর। বিমল নীচে দাঁড়িয়ে রইল। একটা কড়িকাঠ সরিয়ে ওরা তিনজনে একটা দরজা পেলে। তারপর একটা ছোটো ঘর। এ্যালিস অতি কষ্টে ঘরে ঢুকল–সুরেশ্বর ওকে সাহায্য করলে। একটা ন-দশ মাসের শিশু সেই ঘরের মেঝেতে অক্ষত অবস্থায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছে।

এ্যালিস তাকে সন্তর্পণে মেঝে থেকে তুলে সুরেশ্বরের হাতে দিলে। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, ঘরটার মধ্যে অন্ধকার। তিনজনে ঘরের মধ্যে থেকে ইটকাঠের স্তূপটার ওপরে উঠে শুনলে, বিমল উত্তেজিত ভাবে ডাকছে–আঃ কোথায় গেলে তোমরা? চট করে নেমে এসো–বড়ো বিপদ!

চারিদিকের গোলা ফাটবার আওয়াজ ও ছুটন্ত শেলের চাপা

সোঁও-ও রব খুব বেড়েছে। একটা একটা শেল মাঝে মাঝে আকাশেই সশব্দে ফেটে তারাবাজির মতো অনেকখানি আকাশ আলো করে ছড়িয়ে পড়ছে।

এ্যালিস বললে–কী হয়েছে?

বিমল বললে–জাপানি সৈন্যদল যুদ্ধজাহাজ থেকে নেমেছে শহরে–তারা শহর আক্রমণ করছে শুনছি। এইদিকেই আসছে। তাদের হাতে পড়া আদৌ আনন্দদায়ক ব্যাপার হবে না–তোমার হাতে ওকী?

মিনি বললে–একটা ছোট্ট ছেলে। একে কোথায় রাখি বলো তো এখন?

সুরেশ্বর একজন ব্যস্ত ও উত্তেজিত পুলিশম্যানকে জিজ্ঞেস করে জানলে—সমুদ্রের ধারে জাপানি সৈন্যদের সঙ্গে চীনাদের হাতাহাতি যুদ্ধ চলছে। জাপানিরা নগরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে।

এ্যালিস বললে—আমরা এখন ছোটো ছেলেটিকে কোথায় রাখি বলো না? কনসেশনের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। ওর বাপ-মা এই অঞ্চলের অধিবাসী। ছেলের সন্ধান পাবে না কনসেশনে নিয়ে গেলে।

বিমল বললে—পুলিশম্যানদের জিম্মা করে দাও না।

এ্যালিস ও মিনি তাতে রাজি হল না। এই সব চীনা পুলিশম্যান দায়িত্বজ্ঞানহীন, ওদের হাতে ছোট্ট ছেলেকে ওরা দেবে না।

সমস্ত গলিটা বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে লোকজন অন্ধকারে তার মধ্যে কী-সব খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এমন সময়ে পাশের একটা স্তূপে দু-তিনটি হারিকেন লণ্ঠন ও টর্চ জ্বালিয়ে একদল ছোকরা একটি মৃতদেহের ঠ্যাং ধরে বার করছে দেখা গেল।

বিমল উত্তেজিত সুরে বলে উঠল— প্রোফেসর লি! প্রোফেসর লি!

তারপরেই সে ছুটে গেল ছোকরার দলের দিকে। সুরেশ্বর দেখলে ছোকরার দলের নেতা হচ্ছেন দাড়িওয়ালা একজন বৃদ্ধ—এবং তিনি তাদের পূর্বপরিচিত প্রোফেসর লি।

সেই মুমূর্ষদের আর্তনাদ ও পথের লোকের চিৎকারের মধ্যে তিনজনের ব্যাকুল প্রশ্ন বিনিময় হল। প্রোফেসর লি তাঁর ছাত্রদল নিয়ে নিকটেই এক সরাইখানায় ছিলেন—হঠাৎ এই বোমাবর্ষণের দুর্যোগ—এখন তিনি সেবাব্রতী, ছাত্রদের নিয়ে হতাহতদের টেনে বার করা ও তাদের হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন।

এ্যালিস ও মিনির সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেওয়া হল।

বিমল বললে— প্রোফেসর লি, এই ছোটো ছেলেটির কী ব্যবস্থা করা যায় বলুন তো?

সদানন্দ, সৌম্য বৃদ্ধ হাত পেতে বললেন—আমায় দাও। তোমরা ওর বাপ-মায়ের সন্ধান করতে পারবে না, আমি পারব। আর কী জান, ছেলে অনেকগুলি জমেছে—চ্যাং, এদের নিয়ে চলো তো? দেখবে এসো তোমরা—যাবার পথে একটু দূর গিয়েই বিমল বলে উঠল— আঃ, কী ব্যাপার দেখো!

সকলেই দেখলে, সে-দৃশ্য যেমন বীভৎস তেমনি করুণ। সেই বৃদ্ধা ভিখারিনি ঠ্যাং ছড়িয়ে মরে পড়ে আছে–সেই জায়গাতেই। একখানা হাত প্রায় চূর্ণ হয়ে গিয়েছে–পাশেই তার ভিক্ষালব্ধ ভাত-তরকারিগুলি রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে! আশার জিনিসগুলি–মুখেও দিতে পারেনি হয়তো।

এ্যালিসের চোখে জল এল। বিমল ও সুরেশ্বর মাথার টুপি খুলে বসল। মিনি চোখে রুমাল দিয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরালে। কেবল অবিচলিত রইলেন প্রোফেসর লি। তিনি ছাত্রদের বললেন, এই মড়াটাকে একটা কিছু ঢাকা দাও তো হে! এ আর কী? আমাদের দেশের এ তো রোজকার ব্যাপার! এতে বিচলিত হলে চলে না মাদাম!

নিকটেই একটা ঘরের মধ্য প্রোফেসর লি ওদের নিয়ে গেলেন। হারিকেন লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল সে-ঘরের মেঝেতে পাঁচ-ছ-টি নয়-দশমাসের কী এক বছরের শিশু অনাবৃত মেঝের ওপর পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, কেউ কাঁদছে, কেউ হাসছে।

এ্যালিস ছুটে গিয়ে তাদের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে– ও ইউ পুওর ডিয়ারিজ!

প্রোফেসর লি হেসে বললেন–সন্ধ্যা থেকে এতগুলি উদ্ধার করেছি স্তূপ থেকে। আপনাদেরটিও দিন। আমার দু-টি ছাত্র এখানে পাহারা দিচ্ছে–আমরা খুঁজে এনে এখানে জড়ো করছি–রাখো এখানে।

গোলমাল ও ভিড় তখন একটু কমেছে। প্রোফেসর লি সকলকে বললেন–আসুন, একটু চা খাওয়া যাক–রাত্রে আর ঘুম হবে না আজ, সারারাত এইরকমচলবে দেখছি–

যে-ঘরে শিশুগুলিকে জড়ো করা হয়েছে, তার পাশেই একটি ছোটো বাড়িতে লি থাকেন তাঁর ছাত্রবৃন্দ নিয়ে। দু-জন ছাত্রকে শিশুদের কাছে রেখে বাকি সকলে ওদের নিয়ে গেল তাদের সেই বাসায়।

ছোটো ছোটো পেয়ালায় দুধ-চিনি-বিহীন সবুজ চা, শসার বিচি ভাজা, শরবতি লেবুর টুকরো এবং বাঙালি মেয়েদের পাঁয়জোড়ের মতো দেখতে শুয়োরের চর্বিতে ভাজা এক প্রকার কী খাবার।

সুরেশ্বর ও বিমল শেষোক্ত খাবার ঠেলে রেখে দিলে, সে কী এক ধরনের বিশ্রী গন্ধ খাবারে!

প্রোফেসর লি বললেন–আপনারা বিদেশি। আমাদের দেশকে সাহায্য করতে এসেছেন, কিন্তু আমাদের দেশের এখনও কিছুই দেখেননি, দেখলে আপনাদের দয়া হবে। এত গরিব দেশ আর এমন হতভাগ্য–

মিনি বললে–আমাদের সব দেখাবেন দয়া করে প্রোফেসর লি। দেখতেই তো এসেছি–এ্যালিস বললে–আর একটি দেশ আছে প্রোফেসর লি। ভারতবর্ষ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বুটের তলায় পড়ে আছে। ছেলেবেলা থেকে দুস্থ ভারতবর্ষের কথা শুনলে কষ্টে আমার বুক ফেটে যায়।

বিমল এ্যালিসের দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চোখে চাইলে–বড়ো ভালো লাগল এইবিদেশিনি বালিকার এই নিষ্কপট নিঃস্বার্থ সহানুভূতি তার দরিদ্র স্বদেশের জন্যে।

এ্যালিস বললে–শিশুগুলির কে আছে? পুওর লিটল মাইটস। আমায় একটি খোকা দেবেন প্রোফেসর লি?

প্রোফেসর লি হেসে বললেন–কী করবে মিস—

এ্যালিস বললে–আমাদের নাম ধরে ডাকবেন প্রোফেসর লি, ওর নাম মিনি, আমার নাম এ্যালিস। আমরা আপনাকে দাদু বলে ডাকব–কেমন?

এই সদানন্দ উদার, সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধকে এ্যালিসের বড়ো ভালো লেগে গেল। কিউরিও দোকানে বিক্রি হয় যে চীনে মাটির হাস্যমুখ বুদ্ধ-বৃদ্ধের মুখখানা ঠিক যেন তেমনি পরিপূর্ণ সন্তোষ, আনন্দ ও প্রেমের ভাব মাখানো।

প্রোফেসর লি-র মুখ উদার হাসিতে ভরে গেল। বললেন–বেশ তাই হবে।

একটা বড়ো রকমের আওয়াজের দিকে এই সময় প্রোফেসর লি-র জনৈক ছাত্র ওদের সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করলে।

বিমল বললে–বন্দরের দিকে এখনও গোলাবর্ষণ চলছে, হাতাহাতি যুদ্ধও চলছে–ঠিক এই সময় পুলিশম্যান ঘরের দোরের কাছে এসে চীনাভাষায় কী জিজ্ঞেস করলে–লোকটা যেন খুব ব্যস্ত ও উত্তেজিত–সে চলে গেলে প্রোফেসর বললেন–ও বলে গেল খাওয়াদাওয়া শেষ করে কেউ যেন আজ ঘরের বার না হয়–বিশেষত মেয়েরা। জাপানিরা বেওনেট চার্জ করেছিল–আমাদের সৈন্যরা হটিয়ে দিয়েছে শেনসু প্রাচীরের পূর্ব কোণে। কিন্তু আজ রাত্রে আবার ওরা গোলা মারবে, বোমাও ছুড়বে।

চা পান শেষ হল। বিমল বললে– প্রোফেসর লি, মেয়েরা রয়েছেন সঙ্গে, আজ যাই। কনসেশনে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

এ্যালিস বললে–দাদু, আমার একটা খোকা?

প্রোফেসর লি এ্যালিসের মাথায় হাত দিয়ে খেলার ছলে সস্নেহে বলেন– বেওয়ারিশ যদি কোনো খোকা থাকে, পাবে এ্যালিস। কিন্তু কী করবে চীনা ছেলে নিয়ে?

এ্যালিসের এ হাস্যকর অনুরোধ শুনে মিনি তো হেসেই খুন।

চলো চলো এ্যালিস কনসেশনে একটা জ্যান্ত খোকা নিয়ে তোমায় ঢুকতে দেবে কি?

ওরা যখন ফিরে আসছে, দূরে মাঝে মাঝে দুমদাম বিস্ফোরণের শব্দ এবং সাহায্যকারী এরোপ্লেনের হাউইয়ের সাদা অগ্নিময় ধূম দেখা যাচ্ছিল। তবে যেন পূর্বাপেক্ষা অনেক মন্দীভূত হয়ে এসেছে।

সেই রাত্রে কীসের বিষম আওয়াজে বিমলের ঘুম ভেঙে গেল– সে ধড়মড় করে উঠে বিছানার ওপর বসল–কর্ডাইটের শ্বাসরোধকারী ধূমে ও বিশ্রী গন্ধে ঘরটা ভরে গিয়েছে।

ও ডাকলে–সুরেশ্বর–সুরেশ্বর ওঠো–কনসেশনে বোমা পড়ছে!

সঙ্গেসঙ্গে যথেষ্ট হইচই উঠল চারিদিকে।

বোমা! বোমা!

ওরা জানালা দিয়ে দেখলে, যে-ঘরের মধ্যে ওরা শুয়েছিল–তার পুব দিকে আর একটা ঘরের দেওয়াল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়েছে। সেই গোলমালের মধ্যে ভিড় ঠেলে এ্যালিস ছুটতে ছুটতে ওদের ঘরের মধ্যে ঢুকে ডাকলে বিমল! বিমল!

বিমল বললে–এই যে এ্যালিস, তোমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি? মিনি কোথায়?

বলতে বলতে মিনিও ঘরে ঢুকল। বললে–বাইরে এসো, দেখো শিগগির–চট করে এসো–

ওরা বাইরে গেল। কনসেশনের পুলিশের ডেপুটি মার্শাল এসে পৌঁছেছেন দুর্ঘটনার স্থানে। সবাই আকাশের দিকে চাইলে, দু-খানা এরোপ্লেন চলে যাচ্ছে–আলো নিবিয়ে। জনৈক ফরাসি কর্মচারী দেখে বললে–কাওয়াসাকি বম্বার!

বিমল বললে–এ্যালিস, কী করে চেনা গেল জিজ্ঞেস করো না?

www.bengaliebook.com

মিনি বললে–আমি জানি। নীচের দিকে উইং-এ কালো আঁজি কাটা ছুঁচোমুখ প্লেন এই হল জাপানিদের বিখ্যাত বোমা ফেলবার প্লেন কাওয়াসাকি বম্বার। কিন্তু কনসেশনে বোমা! এ-রকম তো কখনো–

সে-রাত্রে আর কারো ঘুম হল না। বিমল খুব খুশি না হয়ে পারলে না, তার মঙ্গলা মঙ্গলের দিকে এ্যালিসের এত আগ্রহদৃষ্টি দেখে। সেই রাত্রে বোমা পড়েছে শুনে এ্যালিস সকলের আগে এসেছে তাঁকে দেখতে, সে কেমন আছে।

শেষ রাত্রের দিকে সবাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল কিন্তু শোরগোলে ওদের ঘুম ভেঙে গেল।

ভীষণ গোলাবর্ষণের শব্দ আসছে–সাংহাই শহরে জাপানি যুদ্ধজাহাজ ও এরোপ্লেন থেকে একযোগে গোলা ও বোমা বৃষ্টি হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে সাংহাই শহর থেকে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-মেয়ে পালিয়ে আসছে। কনসেশনে–বাক্স, তেরঙ্গ, পোঁটলা-পুঁটুলি নিয়ে, ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে। এদের সবারই মুখে ভীষণ ভয়ের চিহ্ন–এদের চক্ষু উদবেগে ও রাত্রি জাগরণে রক্তবর্ণ, চুল রুক্ষ; পাশব বলের কাছে মানুষের কী শোচনীয় পরাজয়!

বেলা দশটার মধ্যে ব্রিটিশ কনসেশনের হাসপাতাল ও মার্কিন রেডক্রশের বড়ো হাসপাতাল আহতের ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

কী ভীষণ আওয়াজ ও গোলমাল পেনসু প্রাচীরের দিকে, সমুদ্রের থেকে মাইল দুই দূরে পূর্ব কোণে। সেখানে চীনা টেনথ রুট আর্মির সঙ্গে জাপানি নৌসৈন্যদের যুদ্ধ চলছে। কনসেশন থেকে যুদ্ধস্থলের দূরত্ব প্রায় তিন মাইল, বিমল জিজ্ঞেস করে জানলে। এ ছাড়াও গোলাবর্ষণ চলছে শহরের বিভিন্ন স্থানে।

টেলিফোনে অর্ডার এল মেডিকেল ইউনিটের বড়ো ডাক্তারের কাছে থেকে–বিমল, সুরেশ্বর, এ্যালিস ও মিনিকে চ্যাং-লিন অ্যাভিনিউতে চীনা সামরিক হাসপাতালে যাবার জন্যে।

ওরা আমেরিকান রেডক্রস মোটরে সামরিক হাসপাতালের দিকে ছুটল। ড্রাইভার খুব বড়ো একটা রেডক্রশ পতাকা গাড়ির বনেটে উড়িয়ে দিলে–এ ছাড়া গাড়ির ছাদের বাইরের পিঠে সারা ছাদ জুড়ে একটা প্রকান্ড লাল ক্রস আঁকা। এত সাবধানতা সত্ত্বেও ড্রাইভার বললে– যদি আপনারা হাসপাতালে পৌঁছোতে পারেন, সে খুব জোর বরাত বুঝতে হবে আপনাদের।

সুরেশ্বর ও বিমল একযোগে বললে কেন?

কনসেশন বা রেডক্রশ কিছুই মানছে না জাপানি বোমারু প্লেন। কালও আমাদের রেডক্রশ ভ্যানে বোমা ফেলেছে– শোনেননি আপনারা সে-কথা?

সে-কথা না শোনাই ভালো। ওদের মোটর কনসেশন থেকে বার হয়ে খানিকটা ফাঁকা মাঠ দিয়ে তির বেগে ছুটল। বিমল দেখলে ড্রাইভার মাঝে মাঝে উপরের দিকে উদবিগ্নদৃষ্টিতে চেয়ে কী দেখছে।

বিমল বললে–কী দেখছ?

বোমারু প্লেন আসছে কিনা দেখছি! এখন আপনাদের পৌঁছে দিতে পারব কিনা জানিনে –তবে চেষ্টা করব–

বলতে বলতে একখানা এরোপ্লেনের আওয়াজ শোনা গেল মাথার ওপর।বিমলের মুখ শুকিয়ে গেল–সামনে উদ্যত মৃত্যুকে কে না ভয় করে? সবাই ওপরের দিকে চাইলে। ড্রাইভার অ্যাক্সিলারেটর পা দিয়ে চেপে স্পিড তুললে হঠাৎ বেজায়।

বিমল চেয়ে দেখলে এরোপ্লেনখানা যেন আরও নীচে নামল–কিন্তু ভাগ্যের জোরেই হোক বা অন্য কারণেই হোক– শেষপর্যন্ত সেখানা ওদের ছেড়ে দিয়ে অন্যদিকে চলে গেল।

ড্রাইভার বললে–জাপানি কাওয়াসাকি বম্বার–ভীষণ জিনিস–নীচু হয়ে দেখলে এ গাড়িতে চীনেম্যান আছে কিনা, থাকলে বোমা ফেলত।

সুরেশ্বর বললে–উঃ কানের কাছ দিয়ে তির গিয়েছে।

এতক্ষণ যেন গাড়ির সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছিল, এইবার একযোগে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

হাসপাতালে পৌঁছে দেখলে সেখানে এত আহত নর-নারী এনে ফেলা হয়েছে যে কোথাও এতটুকু জায়গা নেই। এদের বেশিরভাগ স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা। যুদ্ধের সৈন্যও আছে– তবে তাদের সংখ্যা তত বেশি নয়।

একটি দশ-এগারো বছরের ফুটফুটে সুন্দর-মুখ বালকের একখানা পা একেবারে গুঁড়িয়ে গিয়েছে–আশ্চর্যের বিষয় ছেলেটি তখনও বেঁচে আছে এবং কিছুক্ষণ আগে

অজ্ঞান হয়ে থাকলেও এখন তার জ্ঞান হয়েছে এবং যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করছে। বিমলের ওয়ার্ডেই সে বালকটি আছে। এ্যালিস সেই ওয়ার্ডেই নার্স।

এ্যালিস পেশাদার নার্স নয়, বয়সেও নিতান্ত তরুণী, চোখের জল রাখতে পারলে না ছেলেটির যন্ত্রণা দেখে। বিমলকে বললে–একে মরফিয়া খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখো না?

বিমল বললে–তা উচিত হবে না। ওকে এখুনি ক্লোরোফর্মে অজ্ঞান করে পা কেটে ফেলতে হবে। অপারেশন টেবিল একটাও খালি নেই, সব ভরতি। একটা টেবিল খালি পেলেই ওকে চড়িয়ে দেবে।

এ্যালিস বালকটির শিয়রে বসে কতরকমে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে–কিন্তু ওদের সবারই মুশকিল চীনা ভাষা সামান্য এক-আধটু বুঝতে পারলেও বলতে আদৌ পারে না।

সুরেশ্বর হাসপাতালে ঔষধালয়ে সহকারী কম্পাউণ্ডার হয়েছে। সে দু-খানা চীনা বর্ণপরিচয় কোথা থেকে জোগাড় করে এনে ওদের দিয়েছে। এ্যালিস বললে–সুরেশ ঠিক বলছিল সেদিন, এসো তুমি, আমি, মিনি ভালো করে চীনে ভাষা শিখি, নইলে কাজ করতে পারব না–

আর্ত বালকটির শয়নশিয়রে এ্যালিসকে যেন করুণাময়ী দেবীর মতো দেখাচ্ছে, বিমল সে দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। এ্যালিসের প্রতি শ্রদ্ধায় তার মন ভরে উঠল।

সন্ধ্যা সাতটার সময় টেবিল খালি হল।

বালকটিকে টেবিলে নিয়ে গিয়ে তোলা হয়েছে, কতকগুলি ডাক্তারি ছাত্র কিছুদূরে একটা গ্যালারিতে বসে আছে, হাসপাতালের সহকারী সার্জন চীনাম্যান, তিনি ছাত্রদের দিকে চেয়ে কী বলছেন আর একজন ছাত্র ক্লোরোফর্ম পাম্প করছে। বিমল ও এ্যালিস সার্জনকে সাহায্য করবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। সার্জন হেসে বললেন, সকাল থেকে অপারেশনে টেবিলে মরেছে একুশটা, টেবিল থেকে নামাবার তর সয়নি–গরম জলটা সরিয়ে দাও নার্স

এমন সময়ে মাথার ওপরে কোথায় এরোপ্লেনের শব্দ শোনা গেল।

বাইরে যারা ছিল, তারা দৌড়ে ভেতরে এলে, একটা ছুটোছুটি শুরু হল চারিদিকে।

কে একজন বললে–জাপানি বম্বার!

এ্যালিস বললে– রেডক্রসের লাল আলো জ্বলছে বাইরে–হাসপাতাল বলে বুঝতে পারবে–

সার্জন হেসে বললে–নার্স, ওরা কি কিছু মানছে? শক্ত করে ধরে থাকো তুলোটা—

বালক অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। সার্জন ক্ষিপ্র ও কৌশলী হাতে ছুরি চালাচ্ছেন। বিমল নাড়ি ধরে আছে।

বুম-ম-ম-ম!–বিকট বিস্ফোরণের শব্দ কোথাও কাছেই। তুমুল গোলমাল হইচই, আর্তনাদ, হাসপাতালের বাঁ-দিকের অংশে বোমা পড়েছে। উগ্র ধোঁয়া ও নাইট্রোগ্লিসারিনের গন্ধে ঘর ভরে গেল। সার্জন, বিমল বা এ্যালিসের দৃষ্টি কোনোদিকে নেই–ওরা একমনে কাজ করছে। সার্জন দৃঢ় অবিকম্পিত হস্তে ছুরি চালিয়ে যাচ্ছেন, যেন তার অপারেশন টেবিলের থেকে এক-শো গজের মধ্যে প্রলয়কান্ড ঘটেনি, যেন তনি মোটা ফি নিয়ে বড়োলোক রোগীর বাড়ি গিয়ে নিজের নৈপুণ্য দেখাতে ব্যস্ত; গরম জলের পাত্রে ডোবানো ছুরি, ফরসেপ ঘুচ ক্ষিপ্রহস্তে একমনে সার্জনকে জুগিয়ে চলেছে এ্যালিস, একমনে ব্যাণ্ডেজের সারি গুছিয়ে রাখছে, পাতলা লিন্ট-কাপড়ে মলম মাখাচ্ছে। বিমল নাড়ি ধরে আছে।

বাইরে বিকট শব্দ–হুড়মুড় করে হাসপাতালের বাঁ-দিকের উইং-এর ছাদ ভেঙে পড়ল। মহাপ্রলয় চলেছে সে-দিকে–

সার্জন বললেন–নাড়ির বেগ কত?

বিমল–সত্তর।

কে একজন ছুটতে ছুটতে এসে বললে–স্যার, বাঁ-দিকের উইং গুঁড়ো হয়ে গোটা সেপটিক ওয়ার্ডের রোগী চাপা পড়েছে–এদিকেও বোমা পড়তে পারে–তিনখানা বহ্বার–

সার্জন বললেন–পড়লে উপায় কী? নার্স বড়ো ফরসেপটা—

উগ্র ধোঁয়ায় সবারই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আর একটা শব্দ অন্য কোনদিকে হল–আর একটা বোমা পড়েছে–বেজায় ধোঁয়া আসছে ঘরে।

বিমল বললে–স্যার, ধোঁয়ায় রোগী দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে যে? ক্লোরোফর্মের রোগী, এভাবে কতক্ষণ রাখা যাবে?

সার্জন ছুরি ফেলে বললেন–হয়ে গিয়েছে। লিন্ট দাও, নার্স।

বিমল বললে–স্যার, রোগীর নাড়ি নেই। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

সার্জন এসে নাড়ি দেখলেন। এ্যালিস নীরবে ওদের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

নাড়ি থেকে হাত নামিয়ে সার্জন গম্ভীর মুখে বললেন–বাইশটা পুরল।

এ্যালিস নিস্পন্দ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললেন–চলো নার্স, স্ট্রেচার-ওয়ালারা এসে লাশ নিয়ে যাবে–এখন সবাই বাইরে চলো যাই–

ওপরওয়ালার আদেশ পেয়ে বিমল আগে এ্যালিসের কাছে এল এবং তাকে আস্তে আস্তে হাত ধরে ধূম্রলোক থেকে উদ্ধার করে ডান দিকের বড়ো দরজা দিয়ে কম্পাউণ্ডের খোলা হাওয়ায় নিয়ে এল।

আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখেই এ্যালিসকে বললে–ওই দেখো এ্যালিস, তিনখানা জাপানি বম্বার!—

3.এগারো ঘণ্টা ডিউটি

এগারো ঘণ্টা সমানে ডিউটিতে থাকবার পরে বিমল, এ্যালিস, সুরেশ্বর ও মিনি বাইরের ফুটপাথে পা দিলে।

চ্যাং সো লিন অ্যাভিনিউ প্রসিদ্ধ দেশনায়ক চ্যাং সো লির নামে হয়েছে- রেডশার্টদের প্রভাবে। সাংহাইয়ের মধ্যে এটা একটি প্রসিদ্ধ রাস্তা, রাস্তার ধারে ফুটপাথে শামিয়ানার নীচে চা ও শুয়োরের মাংসের দোকান। লোকজনের বেজায় ভিড়।

এই অ্যাভিনিউয়ের ধারেই গভর্নমেন্ট হাসপাতাল। ওরা যখন ফুটপাথে পা দিলে, তখন হাসপাতালের বাঁ অংশে মহা-হইচই চলছে। সেপটিক-ওয়ার্ড জাপানি বোমায় চূর্ণ হয়ে গিয়েছে–সম্ভবত একটা রোগীও বাঁচেনি সে ওয়ার্ডের।

মিনি দেখতে যাচ্ছিল–বিমল বারণ করলে।

ওদিকে গিয়ে দেখে আর কী হবে মিনি? চলো আগে কোথাও একটু গরম চা খাওয়া যাক। বোমা-ফেলা ও হত্যা ব্যাপারটা দেখে দেখে ক-দিনে ওদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। শুধু ওদের নয়, সাংহাই-এর লোকজন, দোকানি, পথিকদেরও। নতুবা গত আধঘণ্টা ধরে হাসপাতালের ওপর বোমাবর্ষণ চলছে, চোখের সামনে এই ভীষণ প্রলয়লীলা ও মাথার ওপরে চক্রাকারে উড়নশীল তিনখানা জাপানি বম্বারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চ্যাং সো লিন অ্যাভিনিউর চায়ের দোকান, মাংসের দোকান, ভাত-তরকারির দোকান সব খোলা। লোকজনের দিব্যি ভিড়।

রাত পৌনে আটটা।

হঠাৎ এ্যালিস জিজ্ঞেস করলে– ছেলেটি মারা গেল, তখন ক-টা?

বিমল বললে–ঠিক সাড়ে সাতটা। ওকথা ভেবো না এ্যালিস। চলো আর একটু এগিয়ে। এক্ষুনি লাশ নিয়ে যাওয়ার ভ্যান আসবে হাসপাতালে। আমরা একটু তফাতে যাই।

একটা শামিয়ানার নীচে ওরা চা খেতে বসল।

দোকানের মালিক একজন রোগা চেহারার চীনা স্ত্রীলোক। সে এসে পিজিন ইংলিশে বললে –কী দেব?

বিমল বললে–খাবার কী আছে?

ভাজা মাছ, রুটি, মাখন আর ব্যাঙের—

থাক থাক, রুটি মাখন ভাজা মাছ নিয়ে এসো–

রুটি-মাখন অন্যত্র চীনা দোকানে পাওয়া যায় না; তবে চ্যাং সো লিন অ্যাভিনিউর দোকানগুলি কিছু শৌখীন ও বিদেশি-ঘেঁষা। ধূমায়িত চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বিমল একটি আরামের নিঃশ্বাস ফেললে। সুরেশ্বর তো গোগ্রাসে রুটি ও মাখনের সদব্যবহার করতে লাগল, খানিকক্ষণ কারো মুখে কথা নেই।

মিনি বললে–একটা গল্প বলি শোনো সবাই। আমি তখন স্কুলে পড়ি, মেল্টোনে, ক্যালিফোর্নিয়ায়। আমার বাবা আমায় একটি চিনচিলা কিনে দিয়েছিলেন–

সুরেশ্বর বললে– সে কী?

মিনি হেসে বললে–জান না? একরকম ছোটো কাঠবিড়ালির চেয়ে একটু বড়ো জানোয়ার। খুব চমৎকার নোম গায়ে–লোমের জন্যে ওদের শিকার করা হয়। তারপর আমার সেই পোষা চিনচিলাটা–

বুম–ম–ম!–বিকট আওয়াজ!

সবাই চমকে উঠল। তিনখানা বাড়ির পরে একটা বাড়ির ওপরে জাপানি বম্বার ঘুরছে দেখা গেল–কিন্তু ধোঁয়া উড়ছে বাড়িটার সামনের রাস্তা থেকে। লোকজন দেখতে দেখতে যে যেখানে পারলে আড়ালে ঢুকে পড়ল। একটু পরে একখানা রিকশা টেনে দু-জন লোককে সেদিক থেকে ওদের দোকানের সামনে দিয়ে যেতে দেখা গেল–রিকশায় আধশোয়া আধবসা অবস্থায় একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ। তার মুখটা থেঁতলে রক্ত গড়িয়ে বুকের সামনে জামাটা রাঙিয়ে দিয়েছে।

শামিয়ানার নীচে আরও তিনটি চীনা খদ্দের বসে চা খাচ্ছিল। তারা উত্তেজিত ভাবে চীনা ভাষায় দোকানিকে কী বললে। দোকানিও তার কী জবাব দিলে, তারপরে ওদের মধ্যে একজন একটি সিগারেট ধরালে।

জাপানি বোমারু প্লেন ঘড় ঘড় শব্দ করে যেন ওদের মাথার ওপরে ঘুরছে। বিমল একবার চেয়ে দেখলে। না : একটু দূরে বাঁ-দিকে। ঠিক মাথার ওপরে নয়।

মিনি বললে–তারপর শোনো, আমার সেই চিনচিলাটা–

www.bengaliebook.com

এ্যালিস অধীরভাবে বললে–আঃ মিনি, থাক চিনচিলার গল্প। খাও এখন ভালো করে। আমার তো বেজায় ঘুম পাচ্ছে! বিমল, দোকানিকে জিগ্যেস করো না, স্যাণ্ডউইচ রাখে না?

বিমল বললে–ব্যাঙের মাংসের স্যাণ্ডউইচ বলছে এ্যালিস–দিতে বলব?

সুরেশ্বর ও মিনি একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই ওদের খাবার জায়গাটা তীব্র সার্চলাইটের আলোয় আলো হতেই ওরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে। ভীষণ ধ্বংসের যন্ত্র সেই চক্রাকারে ভ্রাম্যমাণ জাপানি বম্বরখানা থেকে রাস্তায় যে অংশে ওরা বসে চা খাচ্ছে, সে দিকে সার্চলাইট ফেলেছে।

দোকানি চীনা স্ত্রীলোকটি চিৎকার করে উঠে কী বললে।

সঙ্গেসঙ্গে হুড় হুড় দুড় দুড় শব্দ–তিনজন চীনা খদ্দের ও রাস্তার পথিকদের মধ্যে জন দুই ছুটে এসে বিমলদের চায়ের টেবিলের তলায় ঢুকে মাথা গুঁজে বসে পড়ল।

মিনি বললে–আঃ এগুলি কী বোকা? টেবিলের তলায় বাঁচবে এরা, আমার পেয়ালাটা উলটে ফেলে দিলে মাঝ থেকে—

এ্যালিস বললে–আমারও। দোকানি, তোমার চায়ের দাম নিয়ে নাও, আমরা অন্য জায়গায় চা খেতে যাই–এ কীরকম উপদ্রব?

বিমল বললে–ঠিক তো। মহিলাদের চায়ের টেবিলের তলায় ঢুকে উৎপাত! বোমা খাবি রাস্তায় দাঁড়িয়ে খা ভদ্রলোকের মতো–

মিনি হঠাৎ আঙুল দিয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে বললে–ওই দেখো, দেখো—

তিনখানা চীনা এরোপ্লেন তিন দিকে জাপানি বম্বরখানাকে তাড়া করছে। একখানা চীনা প্লেন বম্বারখানার খুব কাছে এসে পড়েছে–একটু পরেই সেখান থেকে মেশিনগানের পট পট আওয়াজ শোনা গেল–পেছনের আর একখানা চীনা সাহায্যকারী প্লেন ওদের ওপরে নীলাভ তীব্র সার্চলাইট ফেলতেই জাপানি বম্বরখানা বেশ স্পষ্ট দেখা গেল।

ততক্ষণ সবাই আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে উঁকি মেরে আকাশের দিকে চেয়ে ব্যাপারটা দেখছে। আরও দু-জন চীনা খদ্দের অন্য টেবিলে চা খেতে বসে গেল। দোকানি স্ত্রীলোকটি তাদের খাবার দিলে। মিনি তাদের টেবিলের দিকে চেয়ে বললে–ওই ওরা ব্যাঙের স্যাণ্ডউইচ খাচ্ছে–

মেশিনগানের আওয়াজ তখন বড়ো বেড়েছে। জাপানি প্লেনখানা পাক দিয়ে ঘুরছে। হঠাৎ পালাবে না।

বিমল বললে–না; একটু নিরিবিলি চা খেতে এলাম আর অমনি মাথার ওপরে চীন জাপানের যুদ্ধ বেধে গেল–পোড়া বরাত এমনি–

একজন ফিরিওয়ালা এসে শামিয়ানার বাইরে দাঁড়িয়ে বললে– মোমের ফুল–খুব চমৎকার মোমের ফুল গোলাপ, ক্রিসেনথিমাম, গাঁদা–ভারি সস্তা মোমের ফুল–

এমন সময়ে একজন খবরের কাগজওয়ালা সাংহাই ডেলি নিউজ বলে হেঁকে যাচ্ছে দেখে বিমল ডেকে একখানা কাগজ কিনলে। এ কাগজের একদিকে চীনা ভাষায় অন্য দিকে ইংরেজি ভাষায় লেখা খবর–চীনাদের পরিচালিত।

রাস্তায় লোক ভিড় করে কাগজ কিনছে, কাগজ এইমাত্র বেরিয়েছে, এ বেলায় যুদ্ধের খবর নিয়ে সবাই–যুদ্ধের খবর জানতে চায়।

এ্যালিস বললে–যুদ্ধের খবর কী?

তারপর সবাই মিলে ঝুঁকে পড়ে কাগজখানা পড়ে দেখতে লাগল। শেনসু প্রাচীরের কাছে জাপানি সৈন্য চীনাদের কাছে ধাক্কা খেয়ে হটে গিয়েছে। জাপানিদের বহু সৈন্য মারা পড়েছে।

সুরেশ্বর বললে–সর্বৈব মিথ্যা। জাপানিরা জিতছে। ভুল খবর দিচ্ছে আমাদের, পাছে শহরে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। দেখছ না বোমা ফেলবার কান্ড? চীনারা জিতছে! ফুঃ–

ওদের অত্যন্ত আশ্চর্য মনে হল, মাত্র তিন মাইল দূরে শেনসু প্রাচীরের কাছে যুদ্ধ চলছে, অথচ ওদের খবরের কাগজ পড়ে জানতে হচ্ছে যুদ্ধের ফলাফল, যেমন কলকাতায় বসে বা আমেরিকায় বসে লোকে জেনে থাকে। তিন মাইল দূরে থেকেও বোঝবার কোনো উপায় নেই যুদ্ধের আসল খবরটা কী। চীনা সামরিক কর্তৃপক্ষ যে সংবাদ পাঠাচ্ছে সেই সংবাদই ছাপা হচ্ছে। এইরকমই হয় সর্বত্রই, অথচ খবরের কাগজের পাঠকেরা তা জেনেও জানে না। খবরের কাগজে লিখিত সংবাদ বাইবেল বা পুরাণের মতো অভ্রান্ত সত্য হিসেবে মেনে নেয়, এইটেই আশ্চর্য। এ সম্বন্ধে ওদের অভিজ্ঞতা আরও পরে যা হয়েছিল তা আরও অদ্ভুত।

www.bengaliebook.com

কাগজের এক কোণে একটি সংবাদের দিকে মিনি ওদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করলে। মার্শাল চিয়াং কেই শেক চা-পেই পল্লির বোমাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে আসবেন রাত নটার সময়ে।

মিনি হাতঘড়ি দেখে বললে–এখন পৌনে ন-টা।

বিমল বললে–তাহলে হাসপাতালেও যাবেন, চলো আমরা হাসপাতালে ফিরি। মার্শাল চিয়াংকে কখনো দেখিনি, দেখা যাবে এখন।

এমন সময়ে ওদের সামনের রাস্তায় একটি হইচই উঠল। রাস্তার দু-ধারে লোকজন সারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। চীনা পুলিশম্যান রাস্তার মাঝখানে লোক হটিয়ে দিলে। এক মিনিটের মধ্যে পর পর ছ-খানা মোটরকার দ্রুত বেগে বেরিয়ে গেল। রাস্তার জনতা চীনা ভাষায় চিৎকার করে বলে উঠল–মহাচীনের জয়! মার্শাল চিয়াং-এর জয়! টেনথ রুট আর্মির জয়!

এ্যালিস বললে–এই মার্শাল চিয়াং গেলেন!

বিমল বললে–তবে আর হাসপাতালে এখন ফিরে কী হবে? চলো কনসেশনে ফিরি। রাত হয়েছে, এ অঞ্চল এখন রাত্রে বেড়াবার পক্ষে নিরাপদ নয়। জাপানি বোমা তো আছেই,

তা ছাড়া তার চেয়েও খারাপ চীনা দস্যুদের উপদ্রব। সঙ্গে মেয়েরা

সুরেশ্বর বললে–তা ছাড়া ঘুমোতেও তো হবে। কাল সকাল থেকে আবার ডিউটি—

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।

কনসেশনে ফিরবার পথে ওদের বিপদ ঘটল।

কনসেশনে ফিরবার পথে ওরা চ্যাং সো লিন অ্যাভিনিউ দিয়ে খানিকটা এসে পড়ল একটা জনবহুল পাড়াতে। সেখানে দু-খানা রিকশাভাড়া করে ওরা তাদের কনসেশনে যেতে বললে। তারপর ওরা গল্প ও গুজবে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে–যখন ওরা আবার রাস্তার দিকে নজর করলে তখন দেখলে রিকশা একটা নির্জন জায়গা দিয়ে যাচ্ছে। দু-ধারে দরিদ্র লোকেদের কাঁচা মাটির খাপরা-ছাওয়া ঘর। রাস্তা জনশূন্য–দূরে দূরে খোলা মাঠের মধ্যে কী যেন মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে।

বিমল বললে–এ কোথায় নিয়ে এসে ফেল্লে হে?

সুরেশ্বর পিজিন ইংলিশে একজন রিকশাওয়ালাকে বললে–কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস রে? এ পথ তো নয়?

রিকশাওয়ালা কোনো উত্তর না দিয়েই জোরে ছুটতে লাগল।

বিমলের মনে সন্দেহ হল। সে বললে–এর মনে কোনো বদমাইশি মতলব আছে মনে হচ্ছে। আমরা তো একেবারে নিরস্ত্র। সঙ্গে মেয়েরা রয়েছে–

মিনি ও এ্যালিস তখন একটু ভয় পেয়ে গিয়েছে। ওরাও বললে–আর গিয়ে দরকার নেই –চীনা গুন্ডা এই সময় দেশ ছেয়ে ফেলেছে। নামো এখানে সব।

দু-খানা রিকশাই পাশাপাশি যাচ্ছিল। এবার মিনিদের রিকশাখানা এগিয়ে গেল এবং বিমল কিছু বলবার পূর্বেই রিকশাখানা হঠাৎ পথের মোড় ঘুরে পাশের একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

বিমলদের রিকশাখানা কিন্তু তখন সোজা রাস্তা বেয়েই দ্রুত চলেছে। বিমলের ও সুরেশ্বরের চিৎকারে সে আদৌ কর্ণপাত করলে না।

বিমল লাফ দিয়ে রিকশাওয়ালার ঘাড়ে পড়ল রিকশা থেকে। রিকশাখানা উলটে গেল সঙ্গেসঙ্গে। সুরেশ্বর রিকশার সঙ্গে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। রিকশাওয়ালাটা সেখানে বসে পড়ল–ওর ওপর বিমল!

রিকশাওয়ালটা একটু পরেই গা ঝেড়ে উঠে, চীনা ভাষায় কী একটি দুর্বোধ্য কথা বলে উঠে, ওদের দিকে এগিয়ে এল।

বিমল চেঁচিয়ে বলে উঠল–সুরেশ্বর, সাবধান!

রিকশাওয়ালার হাতে একখানা বড়ো চকচকে ছোরা দেখা গেল।

সুরেশ্বর পেছন থেকে তাকে জোরে এক ধাক্কা লাগালে, সে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আবার বিমলেরই উপর। বিমলের সঙ্গে তার ভীষণ ধস্তাধ্বস্তি শুরু হল। বিমলের রীতিমতো শরীরচর্চা করা ছিল। মিনিট পাঁচ-ছয়ের মধ্যে রিকশাওয়ালাকে মাটিতে ফেলে, বিমল তার হাত মুচড়ে ছোরাখানা টান দিয়ে ফেলে বললে–ওখানা তুলে নাও সুরেশ্বর–তারপর এই বদমাইশটার গলায় বসিয়ে দাও–

ছোরা হাত থেকে খসে যাওয়াতে বদমাইশটা নিরুৎসাহ ও ভীত হয়ে পড়ল–এইবার ছোরা বসানোর কথা শুনে, সে বিমলের কাছ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিলে। সব ব্যাপারটা ঘটে গেল পাঁচ-ছ-মিনিটের মধ্যে।

বিমল ঝেড়ে উঠে একটু দম নিয়ে বললে–সুরেশ্বর, মেয়েদের গাড়িখানা!

তারপর ওরা দু-জনেই ছুটল সেই গলিটার দিকে–যেটার মধ্যে মিনিদের রিকশাখানা ঢুকেছে। গলিটা নিতান্ত নোংরা, দু-ধারে কাঁচা টালির ছাদওয়ালা নীচু নীচু বাড়ি–কিছুদূরে একটি সাধারণ স্নানাগার–এখানে নীচশ্রেণির মেয়ে-পুরুষে সাধারণত স্নান করে না– করলেও রাত্রে করে। স্নানাগারের সামনে দু-জন চীনেম্যান দাঁড়িয়ে আছে দেখে, বিমল তাদের পিজিন ইংলিশে জিজ্ঞেস করলে–একখানা রিকশা কোন দিকে গেল দেখেছ?

তাদের মধ্যে একজন বললে–এই বাড়িটার সামনে একখানা রিকশা দাঁড়িয়েছিল একটু আগে।

বিমল ও সুরেশ্বর বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ডাকাডাকি করেও কারো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন বিমল বললে–চলো বাড়ির মধ্যে ঢুকি–

ঘরটা ঢুকেই ওদের মনে হল, এটা একটা চড়ুর আড্ডা। ঘরের মধ্যে চার-পাঁচটা চীনা বাঁশের চেয়ার, একদিকে একটি নীচু বাঁশের তক্তাপোশ। চন্‌ডু খাবার লম্বা নল, ছিটেগুলি গালার বড়ো পাত্রে, চন্‌ডুর আড্ডার সব জিনিসই মজুদ। দেওয়ালে চীনা দেবতার ভীষণ প্রতিকৃতি। ঘরটি লোকশূন্য, নির্জন। এ ধরনের চড়ুর আজ্ঞা ওরা সিঙ্গাপুরে দেখেছে! কিন্তু বাড়ির লোকজন কোথায়? বিমল ও সুরেশ্বর বাড়িটার মধ্যে ঢুকে গেল।

একটা বড়ো ঘরের মধ্যে অনেকগুলি লোক বসে মা জং খেলছে। বিমল বুঝতে পারলে, জায়গাটা শুধু চন্‌ডু নয়, নীচু শ্রেণির জুয়াড়িদের আড্ডাও বটে। ওদের দেখে দু-জন লোক উঠে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে একজন কর্কশ কন্ঠে পিজিন ইংলিশে বললে–কী চাই? কে তোমরা? বিমলের মাথায় চট করে এক বুদ্ধি খেলে গেল। সে কর্তৃত্বের গ্রাম-ভারি চালে বললে, আমরা ব্রিটিশ কনসেশনের পুলিশের লোক। আমাদের সঙ্গে দশজন কনস্টেবল গলির মোড়ে অপেক্ষা করছে। আমাদের সঙ্গে বন্দুক ও রিভলবার আছে! দু-জন মেমসাহেবকে এই আড্ডায় গুম করা হয়েছে–বার করে দাও, নইলে আমরা জোর করে ভেতরে ঢুকে সন্ধান করব। দরকার হলে গুলি চালাব।

এবার একজন প্রৌঢ় লম্বা ধরনের লোক এককোণ থেকে বলে উঠল–আমরা কনসেশনের পুলিশ মানি নে–সাংহাইয়ের পুলিশ মার্শালের সই করা ওয়ারেন্ট দেখাও

বিমল বললে–তুমি জান এটা যুদ্ধের সময়। আমরা জোর করে ঢুকব এবং দরকার হলে এই মা জং-এর জুয়ার আড্ডার প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করে সাংহাই পুলিশের হাতে দেব-এর জন্যে যদি কোনো কৈফিয়ৎ দিতে হয় পুলিশ মার্শালের কাছে আমরা দেব–তুমি মেম সাহেবদের বার করে দেবে কিনা বলো—

লোকটা বললে কোন মেমসাহেবের কথা বলছ? মেমসাহেবের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কী? আমি ভাবছিলুম, তুমি জুয়া আর চড়ুর আড্ডা হিসেবে বাড়ি সার্‌চ করবে বলছ।

বিমল বললে–বেশি কথায় সময় নষ্ট করতে চাইনে–তাহলে আমাদের জোর করতে হল–সুরেশ্বর কনস্টেবলদের ডাকো–

হঠাৎ চিৎকার করে সে বলে উঠল–মাথা নীচু করে বসে পড়ো–বসে পড়ো সুরেশ।

সাঁ করে একটা শব্দ হল এবং ঝকঝকে কী একটা জিনিস ওদের চোখের সামনে এক ঝলক খেলে গেল–ওরা তখন দু-জনেই বসে পড়েছে। সঙ্গেসঙ্গে ওদের পেছনের দেওয়ালে একটা ভারি জিনিস ঠক করে লাগবার শব্দ হল।

সুরেশ্বর পেছন ফিরে চকিতে চেয়ে দেখলে–একখানা বাঁকা ধারালো চকচকে চীনে ছোরা, ছুঁড়ে-মারা ছোরা, ছুঁড়ে মারবার জন্যেই এগুলি ব্যবহৃত হয়– ছোরাখানা সবেগে দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে, আধখানা ফলাসুদ্ধ দেওয়ালের গায়ে গেঁথে গিয়েছে।

সুরেশ্বর শিউরে উঠল–ওরই গলা লক্ষ করে ছোরাখানা ছোড়া হয়েছিল।

ওদের সঙ্গে সত্যিই হাতাহাতি বাধলে বা সবাই একযোগে আক্রমণ করলে নিরস্ত্র বিমল ও সুরেশের কী দশা হত বলা যায় না, কিন্তু বিমল মাটি থেকে উঠেই দেখলে ঘরের মধ্যে আর একজন লোকও নেই।

পালায়নি–হয়তো-বা ওরা লোক ডাকতে গিয়েছে! সুরেশ্বর নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে, খানিকটা দিশাহার হয়ে পড়েছিল। বিমল গিয়ে তার হাত ধরে টেনে তুলে বললে–সুরেশ্বর, এই বেলা উঠে বাড়িটা খুঁজি এসো–এখুনি সব চলে আসতে পারে। একটা ঘর বন্ধ ছিল–বাইরে থেকে তালা দেওয়া। আর সব ঘর খোলা–সেগুলি জনশূন্য। সুরেশ্বর ও বিমল দু-জনেই একযোগে ঘরের দরজায় লাথি মারতে লাগল।

–মিনি–মিনি–এ্যালিস–এ্যালিস—

ঘর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

বিমল বললে–কী ব্যাপার! ঘরের মধ্যে কেউ নেই নাকি?

দু-জনের সম্মিলিত লাথির ধাক্কাতেও দরজার কিছুই হল না। বেজায় মজবুত সেগুন কাঠের দরজা। হঠাৎ বিমলের চোখ পড়ল ঘরের দেওয়ালের ওপরের দিকে। সেখানে একটা ছোটো ঘুলঘুলি রয়েছে। কিন্তু অত উঁচুতে ওঠা এক মহাসমস্যা। বিমল খুঁজতে খুঁজতে একটা জলের টব আবিষ্কার করলে। সেটা উপুড় করে পেতে, মা জং খেলার ঘর থেকে বাঁশের চেয়ার এনে, তার ওপর চাপিয়ে উঁচু করে, বিমল তার ওপর অতি কষ্টে উঠল। সার্কাসের খেলোয়াড় না হলে ওভাবে ওঠা এবং নিজেকে ঠিকমতো দাঁড় করিয়ে রাখা অতীব কঠিন।

সুরেশ্বর টবটা ধরে রইল–বিমল সন্তর্পণে উঠে ঘুলঘুলির কাছে মুখ নিয়ে গেল। নীচে থেকে সুরেশ্বর ব্যথভাবে জিজ্ঞেস করলে–কী দেখছ? কেউ আছে?

–ঘোর অন্ধকার–কিছু তো চোখে পড়ছে না।

–ওদের পরনে নার্সের সাদা পোশাক আছে, অন্ধকারেও তো খানিকটা ধরা যাবে–ভালো করে দেখো

বিমল ভালো করে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করে বলে–উঁহু, কিছুই তো তেমন দেখছিনে–সাদা তো কিছুই নেই–সব কালোয় কালো। আমার মনে হচ্ছে ঘরটায় কিছুই নেই–

উপায়?

দাঁড়াও আগে নামি। উপায় ভাবতে হবে, তার আগে দরজা ভেঙে ফেলতে হবে যে করেই হোক।

নীচে নেমে বিমল গম্ভীর মুখে বললে–সুরেশ্বর, মিনি বা এ্যালিসকে এ ভাবে হারিয়ে আমরা কনসেশনে ফিরে যেতে পারব না। দরকার হলে এজন্য প্রাণ পর্যন্ত পণ–খুঁজে তাদের বার করতেই হবে। তবে তারা যে এই বাড়িতেই বা এই ঘরেই আছে তারও তো কোনো প্রমাণ আমরা পাইনি। তবুও এই ঘরের দরজা ভেঙে, ভেতরটা না দেখে আমরা এখান থেকে অন্য জায়গায় যাব না। তুমি এক কাজ করো। আমি এখানে থাকি–তুমি বাইরে যাও, চীনা পুলিশকে খবর দাও। তাদের বলো কনসেশনে টেলিফোন করতে। দরকার হলে কনসেশনের পুলিশ আসুক। আজ রাতের মধ্যেই

তাদের খুঁজে বার করতেই হবে– নইলে তাদের ঘোর বিপদের সম্ভাবনা। তুমি দেরি কোরো না, চট করে বাইরে চলে যাও।

সুরেশ্বর বললে- তোমাকে একা ফেলে যাব? ওরা যদি দল পাকিয়ে আসে? তুমি নিরস্ত্র।

সেজন্যে ভেব না। মিনি ও এ্যালিস তার চেয়েও অসহায়। সকলের আগে ওদের কথা ভাবতে হবে আমাদের।

সুরেশ্বর চলে গেল।

বিমল একা বাড়িটাতে। উত্তেজনার প্রথম মুহূর্ত কেটে গেলে বিমল এইবার ব্যাপারের গুরুত্বটা বুঝতে পারছে ধীরে ধীরে। মিনি আর এ্যালিস নেই! গুন্ডারা তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছে। ওর মনে হল, কনসেশনের ডাক্তার বেডফোর্ড বলেছিলেন–চীনা-সাংহাইতে মধ্য এশিয়ার বর্বরতার সঙ্গে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা মিলছে। এখানে কনসেশনের বাইরে মানুষের ধনপ্রাণ নিরাপদ নয়। বিশেষ করে এই যুদ্ধ দুর্দিনের সময়ে, দেশে আইন নেই, পুলিশ নেই–প্রত্যেক সবল মানুষ নিজেই পুলিশ। সাবধানে চলাফেরা না করলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা।

কী ভুলই করেছে অতরাত্রে অজানা রাস্তায় অজানা চীনে রিকশাওয়ালার গাড়িতে চড়ে, সঙ্গে যখন মেয়েরা রয়েছে। তার চেয়েও ভুল, সঙ্গে রিভলবার নিয়ে না বেরোনো।

এখান উপায় কী? যদি ওদের সন্ধান না-ই মেলে! কনসেশনে, সে আর সুরেশ্বর মুখ দেখাবে কেমন করে?

স্তব্ধ নির্জন বাড়িটা। সাড়াশব্দ নেই কোনো দিকে। মা জং খেলার ঘরে একটি চীনে লণ্ঠন ঝুলছে। আধো আলো অন্ধকারে বিকট মূর্তি চীনা দেবতার ছবিটা যেন এক হিংস্র দৈত্যের প্রতিকৃতির মতো দেখাচ্ছে সেই একমাত্র আলো সারাবাড়িটাতে। বাকিটা অন্ধকার। আশ্চর্য, কোথায় কলকাতার শাঁখারিটোলা লেন, আর কোথায় সাংহাই-এর এক নীচ শ্রেণির জুয়াড়ির আড্ডা! অবস্থার ফেরে কোথা থেকে মানুষকে কোথায় নিয়ে এসে ফেলে!

এ্যালিস চমৎকার মেয়ে, মিনিও চমৎকার মেয়ে; ওদের বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হলে সে নিজেকে ক্ষমা করবে না। ওদের জন্যে বিমলই দায়ি। হাসপাতাল থেকে বার হয়ে কনসেশনে ফেরা উচিত ছিল।

প্রায় কুড়ি মিনিট হয়ে গিয়েছে। সুরেশ্বরের দেখা নেই। সে কী কনসেশনে ফিরে গিয়েছে নিজেই খবর দিতে?

বিমল আকাশ-পাতাল ভাবছে, এমন সময় এক ব্যাপার ঘটল। রাস্তার আলো হঠাৎ যেন নিবে গিয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। এ আবার কী কান্ড!

মিনিট পাঁচ-ছয় কী দশ পরে বাইরে থেকে কে একজন উত্তেজিত গলায় চীনা ভাষায় কী বললে– কোনো সাড়া না পেয়ে আবার বললে। ঠিক যেন কাউকে ডাকছে।

বিমল অবাক হয়ে ভাবছে গুন্ডারা ফিরে এল নাকি!

হঠাৎ দু-জন চীনা ইউনিফর্ম পরা পুলিশম্যান বাড়ির মধ্যে খানিকটা ঢুকে রাগের ও গালাগালির সুরে চেঁচিয়ে কী কথা বলে উঠল।

বিমল ভাবলে সুরেশ্বরের আনীত পুলিশম্যান বাড়ি খুঁজতে এসেছে। ও এগিয়ে যেতে পুলিশম্যান দু-জন একটু আশ্চর্য হল। তারপর পিজিন ইংলিশে উত্তেজিত কণ্ঠে মা জং খেলার ঘরের আলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে–আলো এখুনি নিবোও। আমাদের বাঁশি শুনতে পাওনি? আলো জ্বেলে রেখেছ কেন?

বিমল হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে বললে–আলো, জ্বেলে রেখেছি কেন?

হ্যাঁ, আলো জ্বালিয়ে রেখেছ কেন? আলো, আলো, লণ্ঠন–যা থেকে আলো বার হয়, অন্ধকার দূর করে সেই আলো–

আমি তো জ্বেলে রাখিনি। এ আমার বাড়ি নয়।

চীনা পুলিশম্যান দু-জন মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। এ বাড়ির যে এ লোক নয়, তারা সেকথা আগেই বুঝেছিল।

বিমল এতক্ষণে যেন সংবিৎ ফিরে পেল। বললে–দাঁড়াও, তোমরা যেও না! প্রথমে বলো আলো নিবিয়ে দেব কেন?

মিস্টার, সাংহাই পুলিশ-মার্শালের নোটিশ দেখনি? রাত এগারোটার পরে শহরের সব আলো নিবিয়ে দিতে হবে। ব্ল্যাক আউট। বোমা ফেলছে জাপানিরা। তোমার কি বাড়ি?

আমার এ বাড়ি নয়। সব বলছি, আমি কনসেশনের লোক–যুদ্ধের ডাক্তার, ভারতবর্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি। আমরা চারজনে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে

এইপথে রিকশা করে যাচ্ছিলুম–সঙ্গে ছিলেন দু-টি মার্কিন মহিলা। রিকশাওয়ালা তাঁদের নিরে কোথায় পালিয়েছে। আমাদের রিকশা অন্য পথে নিয়ে গেলে আমরা এই গলির মধ্যে ঢুকে সন্ধান পাই এই বাড়িটার সামনে রিকশাটা মেয়েদের নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমরা বাড়িতে ঢুকে দেখি, এটা মা জং জুয়াড়িদেরও চন্ডুর আড্ডা। ওদের সঙ্গে মারামারি হয়ে যাওয়ার পরে ওরা কোথায় পালিয়েছে। আমার বন্ধু পুলিশ ডাকতে গিয়েছে। তোমরা এসেছ ভালোই হয়েছে, এই তালা-বন্ধ ঘরটা খোলো–আমার বিশ্বাস এরই মধ্যে মহিলা দু-টিকে আটকে রেখেছে।

পুলিশম্যান দু-জন আবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। তারা যে বেজায় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে, মা জং খেলার ঘরে চীনে লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয়ও ওদের মুখ দেখে বিমলের সেটা বুঝতে দেরি হল না। যেন ওরা কখনো ওদের ক্ষুদ্র পুলিশ জীবনে এমন একটা আজগুবি ব্যাপারের সম্মুখীন হয়নি–ভাবখানা এই রকম।

একজন পুলিশ চৌকিদার এগিয়ে বন্ধ ঘরের তালাবদ্ধ দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে বললে– এই ঘর? কই, কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তো?

না, সাড়া দেবে কে? ধরো অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছে।

পুলিশম্যান দুটির মধ্যে একজন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানের মতো অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বললে–না, আমার তা মনে হয় না মিস্টার। তুমি জান না এইসব জুয়াড়ি ও চন্ডুর আড্ডাধারী বদমাইশদের। এ ঘরে ওদের রাখেনি। ওদের গায়ে গহনা ছিল?

একজনের গলায় একটা ঝুটো মুক্তোর মালা ছিল–দু-জনের হাতে দুটো সোনার হাতঘড়ি আর সোনার পাতলা বালা–

এমন সময় বাইরে মোটরের আওয়াজ শোনা গেল, সঙ্গেসঙ্গে হুড়মুড় করে বাড়িতে ঢুকল–আগে-আগে সুরেশ্বর, পেছনে একদল চীনা পুলিশ সঙ্গে একজন কনসেশন পুলিশ।

সুরেশ্বর ঢুকেই বললে–টেলিফোন করে দিয়েছি কনসেশনে–পুলিশ মার্শালকে জানানো হয়েছে। এই একজন কনসেশনের পুলিশম্যানকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে আনলুম। এদিকে মহামুশকিল, শহরে ব্ল্যাক-আউট, আলো জ্বালবার জো নেই–সব ঘুটঘুঁটে অন্ধকার।

ভাঙো দরজা সবাই মিলে।

সকলের সমবেত চেষ্টায় ও ধাক্কায় হুড়মুড় করে দরজা ভেঙে পড়ল।

বিমল সকলের আগে ঘরে ঢুকলে। পেছনে ছটা পুলিশ টর্চ জ্বেলে ঢুকল। তিনটি বড়ো বড়ো জালা ছাড়া ঘরে কিছু নেই। মানুষের চিহ্ন তো নেই-ই।

একজন পুলিশ উঁকি মেরে জালার মধ্যে দেখলে। জালাতে মানুষ তো দূরের কথা, একবিন্দু জল পর্যন্ত নেই। খালি জালা।

মাথার ওপর আকাশে আবার অনেকগুলি এরোপ্লেনের ঘড়ঘড় আওয়াজ শোনা গেল। দু জন পুলিশম্যান উঠোনে গিয়ে হেঁকে বললে–আলো নিবিয়ে দাও, নিবিয়ে দাও, জাপানি বম্বার–

সুরেশ্বর বললে–আরে, এরা বেশ তো! সারা সন্ধ্যেবেলা জাপানিরা বোমা ফেললে, তখন ব্ল্যাক-আউট করলে না–আর এখন এদের হুঁশ হল–

বিমল উপরের দিকে মুখ তুলে বললে–হাঁ, জাপানি কাওয়াসাকি বহুবার। মিনি চিনিয়ে দিয়েছিল কনসেশনে–মনে আছে?

সমস্ত সাংহাই শহর অন্ধকার। সেই আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে–কারণ নক্ষত্রের আলো সাংহাইয়ের পুলিশ মার্শালের আদেশ মানেনি–জাপানি বোমারু প্লেনগুলির শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল, তাও সবসময় নয়। মাঝে মাঝে যেন সেগুলি কোনদিকে চলে যায়, আবার খানিক পরে মাথার ওপরে আসে।

বিমল ভাবছিল, জাপানি বম্বার থেকে আর বোমা ফেলছে না তো!

সুরেশ্বরকে কথাটা বলতে সে বললে–ব্ল্যাক আউটের জন্যে নিশ্চয়। সবাই লুকিয়েছে, রাস্তাঘাটে জনপ্রাণী নেই। কোনোদিকে কোনো শব্দ আছে?

দু-জন চীনা পুলিশ বললে তোমরা বোঝোনি মিস্টার। ওরা বোমা ফেলবে না, এখন সুবিধে খুঁজছে হাই এক্সপ্লোসিভ বোমা ফেলবার। সেই বোমা ফেলে লোকদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার পরে, যেমন সব ভয়ে রাস্তাঘাটে বেরোবে কী পালাতে যাবে, অমনি গ্যাসের বোমা ফেলবে। এখন গ্যাসের বোমা ফেললে তো মানুষ মরবে না, কারণ সব ঘরের মধ্যে জানালা দরজার আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। সেখান থেকে ওদের আগে বার করবে রাস্তায়–পরে সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের বোমা ছাড়বে, এ-ই করে আসছে দেখছি আজ ক-দিন থেকে–

একটু পরে কনসেশনের পুলিশ এল, চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল স্বয়ং এলেন বহু লোকজন নিয়ে। ওদের দিয়ে চড়ুর ও জুয়াড়িদের আড্ডার ছোট্ট উঠোনটা ভরে গেল।

ডেপুটি মার্শাল বললেন–শহরে ব্ল্যাক আউট, ঘুটঘুঁটে অন্ধকার চারিধারে–এক্ষুনি জাপানিরা হাইএক্সপ্লোসিভ বম্ব ফেলবে, তারপরে ফসপেন গ্যাসের বোমায় বিষ ছাড়বে। এ অবস্থায় কী করা যায়? মেয়ে দু-টিকে কোথায় আটকে রেখেছে, কী করে খুঁজি।

কনসেশন পুলিশের কর্মচারীরা বললেন–আপনার এলাকায় যত বদমাইশের আড্ডা আছে, সব হানা দিই চলুন।

কিন্তু তাতে সময় নেবে। এখুনি যেসব ছত্রাকার হয়ে চারিদিকে ছুটে বেরিয়ে পড়বে। দেখছেন না ওপরকার অবস্থা? ওদের প্ল্যান করে নিতে যা দেরি! আচ্ছা, দেখি কতদূর কী হয়। মেয়ে দু-টিকে গুন্ডারা আটকে রেখেছে, মুক্তিপণ আদায় করবার উদ্দেশ্যে। সুতরাং, তাদের প্রাণের ভয় বর্তমানে নেই একথা ঠিকই। সাংহাইতে এ-রকম অনবরত হচ্ছে। এই ভদ্রলোক দু-টি এত রাতে মেয়েদের নিয়ে চা-পেই পল্লিতে বেরিয়ে বড়ো বিবেচনার অভাব দেখিয়েছেন। যত গুন্ডা আর বদমাইশের আড্ডা এই পাড়ায়।

পুলিশের লিস্ট দেখে কাছাকাছি দু-টি বদমাইশের আড্ডায় হানা দেওয়া হল–কিন্তু কোথাও কিছু সন্ধান মিলল না।

তারপর–রাত তখন দেড়টা–এমন এক ভীষণ ব্যাপারের সূত্রপাত হয়ে গেল যে, এর আগে যেসব বোমা ফেলার কান্ড সুরেশ্বর ও বিমল দেখেছে–এর কাছে সেগুলো সব একেবারে ম্লান হয়ে নিষ্প্রভ হয়ে মুছে গেল।

বিমল আর সুরেশ্বরের মনে হল, আকাশ থেকে চারিধারে একসঙ্গে যেন দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র পড়তে শুরু হয়েছে–অসংখ্য। অনেক, অনেক–গুনে শেষ করা যায় না! সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের আওয়াজ, ইট টালি ছোটার শব্দ, দেওয়াল পড়ার ছাদ পড়ার শব্দ–মানুষের কলরব, হইচই, কান্না, পুলিশের হুইসল, মাথার ওপর ঘর্ঘর শব্দ–সবসুদ্ধ মিলিয়ে একটা সুপ্ত দৈত্যপুরীর দৈত্যরা যেন হঠাৎ জেগে উঠে উন্মাদ হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে!

ডেপুটি মার্শাল অর্ডার দিলেন, সব কনস্টেবল একত্র হয়ে গেল। কনসেশন পুলিশের কর্মচারীরা সাহায্য করতে চাইলে, হতাহতদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে। সেই অন্ধকারের মধ্যে টর্চ জ্বেলে অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ অনুসন্ধান করে আহত ও চাপা-পড়া মানুষের সন্ধান চলতে লাগল। কাজ এগোয় না। ভাঙা বাড়ির ইটের রাশি পদে পদে ওদের বাধা দিতে লাগল। একটি চীনা মন্দিরের কাছে চারজন লোক মরে পড়ে আছে। দু-টি ছোটো বাড়ি চুরমার হয়ে সেখানে এমনভাবে রাস্তা আটকেছে যে,

মৃতদেহগুলো টেনে বার করবার উপায়ও রাখেনি। ইটের স্কুপের ওপর উঠে আবার ওদিক দিয়ে নেমে যেতে হল–তবে জায়গাটা পার হওয়া সম্ভব হল।

বিমল চেঁচিয়ে বলে উঠল–সামনে প্রকান্ড বোমার গর্ত, সাবধান!

সবাই চেয়ে দেখলে আন্দাজ ত্রিশফুট ব্যাসযুক্ত একটা প্রকান্ড গহ্বর থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে–এবং গর্তের ধারে এখনও ছটকানো ধাতুর খোলা-ভাঙা টুকরো পড়ে আছে, বিমল টুকরোটা হাতে তুলে নিয়েই ফেলে দিলে–গরম আগুন!

কর্ডাইটের উগ্র গন্ধ জায়গাটায়! ওরা সবাই অবাক হয়ে সেই ভীষণ গর্তটার দিকে চেয়ে রইল।

এমন সময়ে দেখা গেল, ছ-খানা জাপানি প্লেন সারবন্দি হয়ে দক্ষিণ দিক থেকে উড়ে আসছে–ওদের মাথার উপর। বোধ হয় ওদের টর্চের আলো দেখেই আসছে। চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল ঘেঁকে বললেন–সাবধান! বোমার গর্তে লাফ দাও!

সবাই বুঝলে এ অবস্থায় ত্রিশফুট ব্যাসযুক্ত এবং আন্দাজ প্রায় পনেরো ফুট গভীর বোমার গর্তটাই সব চেয়ে নিরাপদ স্থান, সারা চা-পেই পল্লি অঞ্চলের মধ্যে।

ঝুপঝাঁপ! দু-সেকেণ্ডের মধ্যে ওপরে আর কেউ নেই–সবাই গর্তটার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বিমল ওদের সঙ্গে লাফ দিয়েছিল–সঙ্গেসঙ্গে ওর হাঁটু পর্যন্ত পাঁকে পুঁতে গেল, গর্তটার মধ্যে কাদা আর জল-কাদার সঙ্গে বোমার ভাঙা টুকরো মেশানো–সবাই কোনো রকমে জল কাদার মধ্যে মাথা গুঁজে রইল ধার ঘেঁষে–কারণ মাঝখানে থাকলে অনেকখানি নক্ষত্র-খচিত অন্ধকার আকাশ দেখা যায়–তখন আর নিজেকে খুব নিরাপদ বলে মনে হয় না।

ওদের মধ্যে একজন আমেরিকান পুলিশম্যান ওদের বোঝাচ্ছিল যে, এ অবস্থায় কোনো এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেললে ওদের লাগবার কথা নয়– সে নাকি মাথুকুও রণক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে জানে–বোমার গর্তই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান।

আর একজন বললে– কেন, যদি মেশিনগান চালায়?

আগের লোকটা বললে-ফু :! মেশিনগান! এই অন্ধকারে!

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল সেই ছ-খানা প্লেন ঠিক ওদের গর্তের ওপর এসে চক্রাকারে উড়ছে এবং ক্রমে নীচু হয়ে নামছে যেন।

কে একজন বললে–আমাদের টের পেলে নাকি!

মুখের কথা সবারই ওষ্ঠাগ্রে যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে–বুকের রক্ত পর্যন্ত জমাট বেঁধে গেল সকলের। কেবল আগের পুলিশম্যানটি বলতে লাগল– কোনো ভয় নেই–ওরা মেশিনগান ছুঁড়ে কিছু করতে পারবে না–কাওয়াসাকি বম্বারের মেশিনগানের তরিবৎ সুবিধের নয়– হত যদি জার্মান হেঙ্কেল ফিফটিওয়ান, কী স্কুলজ-ব্যাঙ্ক এক-শো এগারো–

সবাই চাপা গলায় বিষম রাগের সঙ্গে একসঙ্গে বলে উঠল–আঃ–চুপ! সঙ্গেসঙ্গে প্লেনগুলো অনেকখানি নেমে এল এবং অকস্মাৎ এক তীব্র সার্চলাইটের আলোয় ওদের বোমার গর্ত এবং চারপাশের আরও অনেক দূর পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠল– ওঠবার সঙ্গেসঙ্গে পটকা বাজির মতো মেশিনগান ছোঁড়ার শব্দে ওদের কানে তালা ধরবার উপক্রম হল।

একজন ফিস ফিস করে বললে–যদি বাঁচতে চাও তো সবাই মড়ার মতো পড়ে থাকো –ভান করো যেন সবাই মরে গিয়েছ–

আগের সেই মার্কিন পুলিশম্যানটি যুক্তিতর্কে অদম্য। সে বলে উঠল–কিছু হবে না দেখো হ্যাঁ হত যদি হেঙ্কেল ফিফটিওয়ান কিংবা—

আবার!

সেই কাদাজলের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে উপুড় হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে থেকে বিমল অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো কথা ভাবছিল না। তার চিন্তা শুধু বর্তমানকে আশ্রয় করে। সংসার নেই, অতীত নেই, ভবিষ্যৎ–শুধু সে আছে, আর আছে–এই দুর্ধর্ষ, বিভীষণ, নিষ্ঠুর বর্তমান। যেকোনো মুহূর্তে মেশিনগানের গুলি ওর জীবলীলা, ওর সমস্ত চৈতন্যের অবসান করে দিতে পারে, সারাদুনিয়া ওর কাছ থেকে মুছে যেতে পারে এক মুহূর্তে যেকোনো মুহূর্তে। কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে, চোখ বুজে ও পড়ে রইল– ওর পাশে সবাই সেইভাবেই আছে–বীরত্ব দেখাবার অবকাশ নেই, বাহুবল বা সাহস দেখাবার অবসর নেই– খোঁয়াড়ের শুয়োরের দলের মতো ভয়ে কাদার মধ্যে ঘাড় গুঁজে থাকা–এর নাম বর্তমান যুগের যুদ্ধ! ওরা আজ দেশপ্রেমিক বীর সৈনিক দল হলেও এর বেশি কিছু করতে পারত না–এই একই উপায় অবলম্বন করতেই হত–অন্য গত্যন্তর ছিল না। অন্য কিছু করা আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। কানের এত কাছে এরোপ্লেনের শব্দ বিমল কখনো পায়নি। এরোপ্লেনের বিরাট আওয়াজ কানে একেবারে তালা ধরাল যে! ওর ভয়ানক আগ্রহ হচ্ছে। একবার মুখ তুলে ওপরের দিকে চোখ চেয়ে দেখে, এরোপ্লেনগুলি গর্তটার কত ওপরে এসেছে।

আওয়াজ–আওয়াজ–এরোপ্লেনের আওয়াজ, মেশিনগানের আওয়াজ। কিন্তু আওয়াজ যত হল, কাজ তত হল না। মেশিনগানের একটি গুলিও বোমার গর্তের মধ্যে পড়ল না। দু তিনবার প্লেনগুলি গর্তের দিকে নেমে এল পুরো দমে, কিন্তু কিছু করতে পারলে না। আওয়াজ, কেবলই আওয়াজ। ক্রমে প্লেনগুলি সরে গেল গর্তের ওপর থেকে, হয়তো দেখে ভাবলে গর্তের লোকগুলি সব মরে গিয়েছে। মড়ার ওপর মেশিনগানের দামি গুলি চালিয়ে বৃথা অপব্যয় করা কেন?

ওরা সবাই গর্ত থেকে উঠে এল। পরস্পরের দিকে চেয়ে দেখলে, কী অদ্ভুত কাদামাখা চেহারা হয়েছে সকলকার! পুলিশের স্মার্ট ইউনিফর্ম একেবারে কাদায় আর ঘোলা জলে নষ্ট হয়ে ভিজে-কাঁথা হয়ে গিয়েছে। মার্কিন পুলিশম্যানটি গর্ত থেকে ঠেলে উঠেই বললে– বলিনি তোমাদের, এরা মেশিনগান ছুঁড়ে সুবিধা করতে পারে না ও এরোপ্লেন থেকে? স্কুলজ ব্যাঙ্কস এক-শো এগারো যদি হত, তবে দেখতে একটি প্রাণীও আজ বাঁচতাম না।

মিনিট পনেরো কেটে গেল। বোমারু প্লেনগুলি আকাশের অন্য দিকে চলে গিয়েছে। কী ভীষণ আওয়াজ! বিমলের মনে পড়ল, এ্যালিস তার নরম সাদা হাত দু-টি তুলে কান ঢেকে বসত– হোয়াট-এ্যান-অ-ফুল রকেট! এ্যালিসের সেই ভঙ্গিটা, তার মুখের কথা মনে পড়তেই বিমলের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল।

এ্যালিস–মিনি–বেচারি এ্যালিস!–কী ভীষণ কালরাত্রি আজ ওদের পক্ষে। সাংহাইয়ের এই দুর্যোগের রাত্রির কথা বিমল কি কখনো ভুলবে জীবনে? কোথায় সে সিঙ্গাপুরে ডাক্তারি করবে বলে বাড়ি থেকে রওনা হল–অদৃষ্ট তাকে কোথায় কী অবস্থায় নিয়ে এসে ফেলেছে।

হঠাৎ পিনাং-এর মন্দিরে সেই নিষ্ঠুর-মূর্তি চীনা রণদেবতার কুটি-কুটিল মুখ মনে পড়ল ওর। রণদেবতা ওদের তাঁর ফাঁদে ফেলেছেন–

একটা প্লেন দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটা বস্তির ওপরে দুটো বোমা ফেললে–ভীষণ আওয়াজ হল–অন্ধকারের মধ্যে একটা আগুনের শিখার চমক দেখা গেল, কিন্তু লোকজনের চেঁচামেচি শোনা গেল না। মার্কিন পুলিশম্যানটি বললে–পঞ্চাশ পাউণ্ডের বোমা! দেখেছ কী কান্ডটা করলে বস্তিতে! লোক সব নিশ্চয় পালিয়েছে।

সুরেশ্বর বললে–ওই দেখো, আর একদল বহুবার দেখা দিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে—

অন্তত বারোখানো সারবন্দি হয়ে এগিয়ে আসছে। এরা যে এলেমেলো ভাবে বোমা ফেলছে না, তা বেশ বোঝা গেল–এদের ধ্বংসলীলার মধ্যে প্ল্যান আছে, শৃঙ্খলা আছে, সমস্ত শহরটা এবং তার প্রান্তস্থিত এই দরিদ্র পল্লি চা-পেই ও অন্যান্য ছড়ানো গ্রামগুলিকে ওরা যেন কতকগুলি কাল্পনিক অংশে ভাগ করে নিয়েছে এবং নিয়ম করে প্রত্যেক অংশে বোমা ফেলছে–কোনো অংশ পরিত্রাণ না পায়।

বিমল লক্ষ করলে অন্ধকারের মধ্যে বস্তির লোকজনেরা খানা-নালার মধ্যে অনেকে মুখ খুঁজে পড়ে আছে–একটা লোক একটা গাছের গুঁড়িতে প্রাণপণে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে কারো মুখ দেখা যায় না– মেয়ে কী পুরুষ বোঝা যাচ্ছে না, যেন ভীত, সন্ত্রস্ত প্রেমূর্তি। সন্ধ্যাবেলার সেই বেপরোয়া ভাব আর নেই।

একমুঠো ছড়ানো নক্ষত্রের মতো কতকগুলি বোমা পড়ল দূরের একটা পাড়ায়– সাংহাইয়ের ব্যাবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র সে জায়গাটা–পুলিশম্যানগুলো বলাবলি করছে। ওদিকে সেই প্লেনগুলো আবার আসছে, তবে এবার সার্চলাইট জ্বালায়নি, অন্ধকারেই আসছে। কাছেই একটা পল্লিতে ওরা ছ-টা বোমা ফেললে, আন্দাজ এক-একটা পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনের। পুলিশের ডেপুটি মার্শালের আদেশে ওরা সবাই সেদিকে ছুটল। সেখানে এক ভীষণ দৃশ্য! রাস্তায় লোকে লোকারণ্য, ভয়ের চোটে সতর্কতা ভুলে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। বাড়িঘর চুরমার, আয়না, মাদুর, টেবিল, ছবি সব ছিটকে রাস্তায় এসে ছত্রাকার হয়ে পড়েছে–তারই মধ্যে এক জায়গায় একটা প্রৌঢ়া মহিলার ছিন্নভিন্ন বিকৃত মৃতদেহ। কিছু দূরে একটি সুন্দরী বালিকার দেহ দু-টুকরো হয়ে পড়ে আছে, তলপেটের নাড়ি ভুড়ি খানিকটা বেরিয়ে ধুলোতে লুটিয়ে পড়েছে।

এইসব বীভৎস দৃশ্যের মাঝখানে এক জায়গায় একটা ছোটো মেয়ে ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে চোখ বুজে ছুটে একটা ছোটো মাঠ পার হয়ে পালাচ্ছিল–পুলিশের লোক ওকে ধরে ফেলল। মেয়েটির বয়স ন-বছর– সে ভয়ে এমনি দিশেহারা হয়ে পড়েছে যে প্রথম কিছুক্ষণ কথা বলতেই পারলে না।

ওর হাতে একটা পুটুলি। পুঁটুলির মধ্যে কিছু শুকনো শুয়োরের মাংসের টুকরো আর গোটাকতক কিশমিশ। তাকে খানিকক্ষণ ধরে জিজ্ঞেস করার পরে জানা গেল তাদের বাড়িতে বোমা পড়বার পরে বাড়ি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কে, কোথায় গিয়েছে তা সে জানে না। সে কিছু খাবার সংগ্রহ করে পুটুলি বেঁধে নিয়ে পালাচ্ছে–তার বিশ্বাস, চোখ বুজে ছুটে পালালে বোমা ফেলে যারা, তারা ওকে দেখতে পাবে না। তাকে ডেকে নিয়ে প্রৌঢ়া মহিলার মৃতদেহ দেখানো হল।

খুকি চিৎকার করে কেঁদে উঠল, ওই তার মা। পাশের বালিকাটি তার দিদি। ডেপুটি মার্শাল পাড়ার একজন লোক ডেকে মেয়েটির নাম-ধাম, বাপের নাম ঠিকানা জেনে নিলেন, কারণ ছেলেমানুষ পুলিশের প্রশ্নের উত্তর ঠিকমতো দিতে পারবে না। মেয়েটি পুলিশের জিম্মাতেই রইল–কারণ শোনা গেল ওর বাবা বছর-তিন মারা গিয়েছেন, বিধবা মা আর দিদি ছাড়া সংসারে ওর আর কেউ ছিল না।

একদল লোককে দেখা গেল ভাঙা বাড়িগুলো থেকে জিনিসপত্র, মৃতদেহ টেনে বার করছে। ওরা টর্চ জ্বেলে টর্চের মুখ নীচের দিকে নামিয়ে মৃতদেহ কী জ্যান্ত মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে, পাছে ওপর থেকে বোমারু প্লেনগুলি টের পায়।

বিমল তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারলে। সাগ্রহে সে ছুটে গেল– প্রোফেসর লি, প্রোফেসর লি–

অন্ধকারের মধ্যে বিমলকে উনি চিনলেন। বললেন–আমি আমার ছাত্রের দল নিয়ে বেরিয়েছি, দেখি যদি কিছু করতে পারি। আমার মেয়েরা কোথায়?

এই সৌম্যদর্শন, পরহিতব্রতী বৃদ্ধের স্নেহ-সম্ভাষণে বিমলের মন আদ্র হয়ে উঠল। বললে –সে অনেক কথা। আমার মনে হয় আপনি এবং আপনার দলই এ বিষয়ে আমায় সাহায্য করতে পারবেন।

প্রোফেসর লি হাসিমুখে বললেন–যুদ্ধের সময়কার মনস্তত্ত্ব আলোচনা করতে এসেছিলুম জানেন তো? এর চেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র আর কোথায় পাব সে আলোচনার?

হঠাৎ একটা প্লেন মাথার ওপর এল। সবাই কথা বন্ধ করে ওপর দিকে চাইলে।

মার্কিন পুলিশম্যানটি চেঁচিয়ে উঠল–কভার! কভার!

কোথায় আর আশ্রয় নেবে, সেই ভাঙা বাড়ির ইটকাঠের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকা ছাড়া সবাই সেই দিকে ছুটল। বিমলও চীনা খুকিটার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল সেইদিকে।

প্লেন থেকে বোমা পড়ল না। পড়ল কতকগুলি চকচকে রুপোর বাতিদানের মতো লম্বা লম্বা জিনিস। প্লেনটা চলে গেলে ওরা সেগুলি দূর থেকে ভয়ে ভয়ে দেখলে। সরু সরু রুপোর নলের মতো জিনিস, হাতখানেক লম্বা। ঝকঝকে সাদা। মার্কিন পুলিশম্যান একটা হাতে তুলে নিয়ে বললে–ইনসেনডিয়ারি বম্ব–আগুন লাগাবার বোমা–অ্যালুমিনিয়ম আর ইলেকট্রনের খোল, ভেতরে অ্যালুমিনিয়ম পাউডার আর আয়রন অক্সাইড ভরতি। এই দেখো ছ-টা করে ফুটো টিউবের গোড়ার দিকে। এই দিয়ে আগুনের ফুলকি বার হয়ে আসবে। এ আগুন নিবানো যায় না।

জাপানিদের মতলব এবার স্পষ্ট বোঝা গেল। হাই এক্সপ্লোসিভ বোমা ফেলবার পর লোকজন ভয়ে দিশেহারা হয়ে যে যেদিকে পালাবে, তখন ওরা শহরে ইনসেনডিয়ারি বম্ব ফেলে আগুন লাগিয়ে দেবে, আগুন নিবোতে কে এগোবে তখন!

কী ভীষণ ধ্বংসের আয়োজন! বিমল সেই ঝকঝকে পালিশ করা সরু টিউবটা হাতে নিয়ে শিউরে উঠল। এই টিউবের মধ্যে সুপ্ত অগ্নিদেব এখুনি জেগে উঠে এইএত বড়ো সাংহাই শহরটা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেবে, তারই আয়োজন চলছে।

মার্কিন পুলিশম্যানটি বললে–পঁয়ষট্টি গ্রাম অ্যালুমিনিয়াম পাউডার আর পঁয়ত্রিশ গ্রাম আয়রন অক্সাইড। আমাদের মার্কিন নৌবহরের উড়োজাহাজে আজকাল এর চেয়েও ভালো বোমা তৈরি হচ্ছে–আয়রন অক্সাইডের বদলে দিচ্ছে—

কাছেই আরও দু-তিনটে রুপোর বাতিদান পড়ল।

4.ধুলো কাদা মাখা চেহারা

দিনের বেলায় ওরা পরস্পরের ধুলো কাদা মাখা চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল। প্রোফেসর লি তখনও কাজে ব্যস্ত, চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ থেকে লোকজন টেনে বার করে বেড়াচ্ছেন, তিনি আর তাঁর ছাত্রেরা। পুলিশও এসেছে, দুটো রেডক্রসের হাসপাতাল গাড়িও এসেছে। আকাশে জাপানি বোমারু প্লেনগুলির চিহ্ন নেই।

রাত্রিটা কেটে গিয়েছে যেন একটা দুঃস্বপ্নের মতো। বেলা এখন দশটা–এখনও সে দুঃস্বপ্নের জের মেটেনি! বিনা কারণে এমন নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলার তান্ডব যে চলতে পারে তা এর আগে, ভারতবর্ষে থাকতে বিমল কখনো ভেবেছিল?

কনসেশনে সেই সবজান্তা আমেরিকান পুলিশটা বলছিল–দেখবেন ওরা ইনসেনডিয়ারি বোমা ফেলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করবে। এখানে অনেক বাড়িই কাঠের। তাতে আবার বোমার আগুন জলে নেবে না। বালি ছড়াতে হয় একরকম কল দিয়ে। প্রথম অবস্থায় বোমাটাকে বালি বোঝাই থলে দিয়ে চেপে ধরলেও আর স্পার্ক ছোটে না–কিন্তু সেসব করে কে?

চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল বললেন–কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে হাই এক্সপ্লোসিভ বোমায়। কাল সন্ধ্যা ও রাতের বোমা ফেলার দরুন চা-পেই পাড়া ও সাংহাইয়ের চ্যাং সো লিন অ্যাভিনিউতে সাত-আট-শো বাড়ির চিহ্ন নেই–মানুষ মারা পড়েছে তিন-শোর ওপর, মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে। জখম হয়ে হাসপাতালে গিয়েছে প্রায় পাঁচ শো। তাদের মধ্যে অর্ধেকের বাঁচবার আশা নেই।

প্রোফেসর লি বললেন–আমাদের সবচেয়ে ভীষণ শত্রু যে এই বোমারু প্লেনগুলি, তা ক দিনের ব্যাপারে আমরা বুঝতে পারছি। তবুও তো এখনো ওরা সমবেতভাবে আক্রমণ করেনি–করলেও এক-শোখানা প্লেনের প্রত্যেক প্লেনখানা থেকে দু-টন বোমা ফেললে পাঁচ হাজার লোক কালই মেরে ফেলত।

সবজান্তা পুলিশম্যানটি বললে–জাপানি বম্বারগুলি এক-একখানা দু-টন বোমা বইতে পারে না মশায়– সে পারে জার্মান ডর্নিয়ের কিংবা ইটালির কাপ্রোনি—কিংবা–

ডেপুটি মার্শাল বললেন–আহা হা, ও সব এখন থাক–ও তর্কে কী লাভ আছে? এখন আমাদের দেখতে হবে যে দু-টি মার্কিন মহিলাকে কাল রাত্রে গুন্ডারা নিয়ে গিয়েছে, তাঁদের উদ্ধারের কী উপায় করা যায়, বোমা এখন এবেলা অন্তত আর পড়বে না–

এমন সময়ে একজন চীনা পুলিশ সার্জেন্ট মোটর সাইকেলে ছুটে এসে সংবাদ দিলে, কনসেশন অঞ্চলে চীনা পলাতক নর-নারীদের সঙ্গে কনসেশন পুলিশের ভয়ানক

দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। ওরা ইয়াং সিকিয়াং-এর ব্রিজ পার হয়ে যাচ্ছিল, কনসেশন পুলিশ ব্রিজের ওমুখে মেশিনগান বসিয়েছে–তারা বলছে এত পলাতক লোক জায়গা দেবার স্থান নেই কনসেশনে। খাবার নেই, জল নেই। গেলে সেখানে দুর্ভিক্ষ হবে।

প্রোফেসর লি বললেন–কত লোক পালাচ্ছিল?

তা বোধ হয় দশ হাজারের কম নয়। অর্ধেক সাংহাই ভেঙে মেয়ে-পুরুষ সব পালাচ্ছে কনসেশনের দিকে। আপনারা সব চলুন, একটু বোঝান ওদের। রাত্রির ব্যাপারে সব ভয় খেয়েছে বড়।

কনসেশনের পুলিশদলকে চলে যেতে উদ্যত দেখে বিমল বললে–আজইমেয়ে দুটির ব্যবস্থা আপনাদের করতে হবে– দেরি হলে ওদের খুঁজে বার করা শক্ত হবে হয়তো।

চীনা পুলিশের ডেপুটি মার্শাল বললেন–সে-বিষয়ে ওঁরা কিছু সাহায্য করতে পারবেন । বদমাইশদের লিস্ট আমাদের কাছে আছে। আমি আজ এখুনি এর ব্যবস্থা করছি। ব্যস্ত হবেন না– বিদেশি গভর্নমেন্টের কাছে এজন্যে আমাদের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি।

সেদিন সারাদিন ওরা হাসপাতালে গেল না। ডাক্তার সাহেবকে জানিয়ে দিলে মিনি ও এ্যালিসের বিপদের কথা। কনসেশনে যাবার জন্যে দু-বার চেষ্টা করেও কৃতকার্য হল না। সে-পথ লোকজনের ভিড়ে বন্ধ হয়ে আছে, তা ছাড়া ইয়াং সিকিয়াংয়ের পুলের ওপারের মুখে মেশিনগান বসানো।

সারাদিন ধরে কী করুণ দৃশ্য সাংহাইয়ের বাইরের বড়ো বড়ো রাজপথগুলিতে! লোকজন মোট-পুঁটুলি নিয়ে শহর ছেড়ে পালাচ্ছে–সাংহাই থেকে যোনান যাবার রাজপথ পলাতক নর-নারীতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ভয়ানক গরমে এই ভিড়ে অনেকে সর্দি-গর্মি হয়ে মারাও পড়ছে।

দু-খানা হাসপাতালের গাড়ি ওদের সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়েছিল কিন্তু ভিড় ঠেলে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব দেখে গাড়ি দুখানা শহরের উপকণ্ঠে এক জায়গায় পথের ধারেই দাঁড়িয়ে রইল। একখানা গাড়ির চার্জ নিয়ে বিমল সেখানে রয়ে গেল। সুরেশ্বর রইল তার সহকর্মী হিসেবে।

শীঘ্রই কিন্তু কী ভয়ানক বিপদে পড়ে গেল দু-জনেই। ওরা অনেকক্ষণ থেকেই ভাবছিল এই ভীষণ ভিড়ের মধ্যে জাপানি প্লেন যদি বোমা ফেলে তবে যে কী কান্ড হবে তা কল্পনা করলেও শিউরে উঠতে হয়।

বেলা দুটো বেজেছে। একজন তরুণ চীনা সামরিক কর্মচারী মোটরবাইকে সাংহাইয়ের দিক থেকে এসে ওদের অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির সামনে নামল। বললে– আপনারা এখান থেকে সরে যান–

বিমল বললে– কেন?

জাপানি সৈন্য শহরের বড়ো পাঁচিল ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে–এখনও দুটো পাঁচিল বাকি–কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যে ওরা সমুদ্রের ধারে সমস্ত দিকটা দখল করবে। আর আমরা খবর পেয়েছি পঞ্চাশখানা বোমারু প্লেন একঘণ্টার মধ্যে শহরের ওপরআবার বোমা ফেলবে।

এই লোকগুলির অবস্থা তখন কী হবে?

চীনের মহাদুর্ভাগ্য, স্যার। আপনারা বিদেশি, আপনাদের প্রাণ আমরা বিপন্ন হতে দেব না। আমরা মরি তাতে ক্ষতি নেই। অপনারা সরে যান এখান থেকে।

একটি গাছের তলায় একটি বৃদ্ধা বসে। সঙ্গে একটা পুঁটুলি, গোটা কতক মাটির হাঁড়ি কুঁড়ি। মুখে অসহায় আতঙ্কের চিহ্ন।

সামরিক কর্মচারীটি কাছে গিয়ে বললে– কোথায় যাবে?

বৃদ্ধা ভয়ে ভয়ে সৈনিকটির দিকে চাইল কিন্তু চুপ করে রইল। উত্তর দিলে না। সৈনিকটি আবার জিজ্ঞেস করলে– কোথায় যাবে তুমি? তোমার সঙ্গে কে আছে?

এবারও বুড়ি কিছু বললে না।

বিমল বললে–বোধ হয় কানে শুনতে পায় না। দেখছ না ওর বয়েস অনেক হয়েছে। চেঁচিয়ে বলো।

তরুণ সামরিক কর্মচারী বৃদ্ধার নাতির বয়সি। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বললে–ও দিদিমা, কোথায় যাচ্ছ?

বুড়ি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে–কোথায় আর যাব? সবাই যেখানে যাচ্ছে।

এখানে বসে থেকো না। বোমা পড়বে এক্ষুনি। সঙ্গে কেউ নেই?

বোমার কথা শুনেই বুড়ি ভয়ে আড়ষ্ট হল, ওপরের দিকে চাইলে। বললে–আমি আর হাঁটতে পারছি না, আমার আর কেউ নেই, আমাকে তোমরা একখানা গাড়ির ওপর উঠিয়ে দাও।

বিমল বললে–আমি ওকে অ্যাম্বুলেন্সে উঠিয়ে দিচ্ছি। বড় বয়েস হয়েছে, এতখানি পথ ছুটোছুটি করে এসে হাঁপিয়ে পড়েছে।

দু-জনে ওকে ধরাধরি করে গাড়িতে এনে ওঠালে।

এক জায়গায় একটি গৃহস্থ পরিবারের ঠিক এই অবস্থা। গৃহিণীর বয়েস প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ, সাত আটটি ছেলে-মেয়ে, সকলের ছোটোটি দুগ্ধপোষ্য শিশু, বাকি সব দুই, চার, পাঁচ, সাত এমনি বয়েসের। সঙ্গে একটিও পুরুষ নেই। ওরাও হাঁটতে না পেরে বসে পড়েছে।

জিজ্ঞেস করে জানা গেল বাড়ির কর্তা জাহাজে কাজ করেন–জাহাজ আজ কুড়ি দিন হল বন্দর থেকে ছেড়ে গিয়েছে। এদিকে এই বিপদ! কাজেই মা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন বাড়ি থেকে কোথায় যাবেন ঠিক নেই।

এদের অসহায় অবস্থা দেখে বিমলের খুব কষ্ট হল। কিন্তু তার কিছু করবার নেই। কত লোককে সে হাসপাতাল গাড়িতে জায়গা দেবে?

সে-দিন শহরের এমন ভয়ানক অবস্থা গেল যে কে কার খোঁজ রাখে! মিনি ও এ্যালিসের উদ্ধারের কোনো চেষ্টাই হল না। সারা দিনরাত এমনি করে কাটল।

রাত্রি শেষে জাপানি নৌসেনা সাংহাই শহরের দক্ষিণ অংশ অধিকার করলে। বিমল ও সুরেশ্বর তখন হাসপাতালে। ওরা কিছুই জানত না। তবে ওরা এটুকু বুঝেছিল যে অবস্থা গুরুতর। সারারাত্রি ধরে জাপানি যুদ্ধ-জাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ করলে। বোমারু প্লেনগুলির তেমন আর দেখা নেই, কারণ শহর প্রায় জনশূন্য। পথে-ঘাটে লোকজনের ভিড় নেই বললেই চলে।

রাত তিনটে। এমন সময় ওয়ার্ডের মধ্যে কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্য ঢুকতে দেখে বিমল প্রথমটা বিস্মিত হল; তারপরই ওর মনে হল এরা চীনা নয়, জাপানি সৈন্য। ক্রমে পিলপিল করে বিশ ত্রিশজন জাপানি সৈন্য হাসপাতালের বড়ো হলটার মধ্যে ঢুকল। চারিদিকে শোরগোল শোনা গেল। রোগীর দল অধিকাংশই বোমায় আহত নাগরিক, তারা ভয়ে কাঠ হয়ে রইল জাপানি সৈন্য দেখে।

www.bengaliebook.com

বিমল একা আছে ওয়ার্ডে। হাসপাতালের বড়ো ডাক্তার খানিকটা আগে চলে গিয়েছেন। ওই এখন কর্তা। দু-জন চীনা নার্স ভয়ে অন্য ওয়ার্ড থেকে ছুটে এসে বিমলের পেছনে দাঁড়াল।

হঠাৎ একজন জাপানি সৈন্য বন্দুক তুলে জমির সঙ্গে সমান্তরালভাবে ধরলে–রাইফেলের আগার ধারালো বেয়নেট ঝকঝক করে উঠল। চক্ষের নিমেষে সে এমন একটা ভঙ্গি করলে তাতে মনে হল বিমলদের দেশে সিঁটকি জালে মাছ ধরবার সময় জালের গোড়ার দিকের বাঁশটা যেমন কাদাজলের মধ্যে ঠেলে দেয়–তেমনি। সঙ্গেসঙ্গে একটা অমানুষিক আর্তনাদ শোনা গেল। পাশের বিছানায় একটা চীনা যুবক রোগী শুয়ে ভয়ে ভয়ে ওদের দিকে চেয়েছিল –বেওনেট তার তলপেটটা গেঁথে ফেলেছে। চারিদিকে রোগীরা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। রক্তে ভেসে গেল বিছানাটা। সে এক বীভৎস দৃশ্য।

বিমলের মাথা হঠাৎ কেমন বেঠিক হয়ে গেল এই নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড দেখে। সে এগিয়ে এসে ইংরেজিতে বললে তোমরা কি মানুষ না পশু?

জাপানি সৈন্যেরা ওর কথা বুঝতে পারলে না–কিন্তু ওর দাঁড়াবার ভঙ্গি ও গলার সুর শুনে অনুমান করলে মানে যাই হোক, প্রীতি ও বন্ধুত্বের কথা তা নয়।

অমনি সব ক-জন সৈন্য ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বন্দুক তুললে।

বিমল চোখ বুজলে–ও-ও বুঝলে এই শেষ।

সেই দু-জন চীনা তরুণী নার্স, যারা ওর পেছনে এসে আশ্রয় নিয়েছিল–তারা ভয়ে দিশাহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। হাসপাতালের সবাই বিমলকে ভালোবাসত।

এমন সময় বিমলের কানে গেল পেছন থেকে একটা সামরিক আদেশের ক্ষিপ্র, স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ সুর। জাপানি ভাষায় হলেও তার অর্থ যেন কোন অদ্‌ভুত উপায়ে বুঝে ফেলে চোখ চাইলে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একজন জাপানি সামরিক কর্মচারী, লেফটেন্যান্টের ইউনিফর্ম পরা। সৈন্যেরা ততক্ষণ বেওনেট নামিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়েছে।

জাপানি অফিসারটি এগিয়ে এসে জাপানি ভাষাতেই কী প্রশ্ন করলে। তিন-চারজন সৈন্য একসঙ্গে ওর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কী বললে।

জাপানি অফিসার বিমলের দিকে চেয়ে ভাঙা ইংরেজিতে বললে–তুমি আমার সৈন্যদের গালাগালি দিয়েছ?

বিমল বললে–তোমার সৈন্যরা কী করেছে তা আগে দেখো। এটা রেডক্রস হাসপাতাল। এখানে কেউ যোদ্ধা নেই। অকারণে তোমার সৈন্যেরা আমার ওই রোগীটিকে খুন করেছে বেওনেটের ঘায়ে।

জাপানি অফিসার একবার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে রক্তাক্ত বিছানা ও মৃত রোগীর দেহটার দিকে চেয়ে দেখলে এবং তারপর সম্ভবত ভসনার সুরে সৈন্যদের কী বললে।

তারপর বিমলের দিকে চেয়ে বললে–তুমি কোন দেশের লোক?

ভারতীয়।

রেডক্রসের ডাক্তার?

না, আমি চীনা মেডিকেল ইউনিটের ডাক্তার।

ও! চীনেদের সাহায্য করতে এসেছ ভারতবর্ষ থেকে?

হ্যাঁ।

আমার সৈন্যদের অপমান করতে তুমি সাহস করো?

আমার সামনে আমার রোগী খুন করল ওরা, তার প্রতিবাদমাত্র করেছি।

হঠাৎ জাপানি অফিসারটি ঠাস করে একটা চড় মারলে বিমলের গালে। পরক্ষণেই সেই ক্ষিপ্র তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট সামরিক আদেশের সুর গেল ওর কানে–রাগে অপমানে, চড়ের প্রবল ঘায়ে দিশাহারা ওর কানে। সব ক-জন সৈন্য মিলে তক্ষুনি ওকে ঘিরে ফেললে চক্ষের নিমেষে। দু-জন ওকে পিছমোড়া করে বাঁধলে চামড়ার কোমরবন্ধ দিয়ে। তারপর ওকে নিয়ে হাসপাতালের বাইরে চলল রাইফেলের কুঁদোর ধাক্কা দিতে দিতে। চীনা নার্স দু-জন ভয়ে কাঠ হয়ে চেয়ে রইল।

বিমলকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হল, সেখানটা একটা ছোটো মাঠের মতো। একদিকে একটা নীচু বাড়ি।

মাঠের এক পাশে একটি ছোটো টেবিল ও চেয়ার পেতে জনৈক জাপানি সামরিক কর্মচারী বসে। তার চারিপাশে সশস্ত্র জাপানি সৈন্যের ভিড়। কিছুদূরে দেওয়াল থেকে পনেরো হাত দূরে একসারি রাইফেলধারী সৈন্য দাঁড়িয়ে। আরও অনেক জাপানি সৈন্য মাঠটার মধ্যে এদিকে-ওদিকে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে।

এ জায়গাটাতে কী হচ্ছে বুঝতে পারলে না।

ওকে নিয়ে গিয়ে টেবিলের কিছুদূরে দাঁড় করালে সৈন্যরা, তখন ও চেয়ে দেখলে দু-জন চীনাকে জাপানি সৈন্যেরা ঘিরে টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। চেয়ারে উপবিষ্ট জাপানি অফিসারটি কী জিজ্ঞেস করছে সৈন্যদের। চীনা দু-টি সৈন্য নয়, সাধারণ নাগরিক, বিমল ওদের দেখেই বুঝলে। একটু পরেই জাপানি অফিসারটি কী একটা আদেশ দিয়ে হাত নেড়ে চীনা দু-টিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বললে।

জাপানি সৈন্যেরা তাদের টেনে নিয়ে গিয়ে মাঠের ওদিকে যে বাড়িটা, তার দেওয়ালের গায়ে নিয়ে দাঁড় করালে।

চীনা লোক দু-টির মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে–তারা কলের পুতুলের মতো জাপানিদের সঙ্গে চলল বটে, কিন্তু তাদের চোখের অবাক ভাব দেখে মনে হয় তারা বুঝতে পারেনি কেন তাদের দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো হচ্ছে।

বিমলও প্রথমটা বুঝতে পারেনি, সে বুঝলে–যখন দশজন জাপানি সৈন্যের সারি এক যোগে রাইফেল তুললে।

একটা তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট, সামরিক আদেশ বাতাস চিরে উচ্চারিত হল, সঙ্গেসঙ্গে দশটি রাইফেলের এক যোগে আওয়াজ। বিমল চোখ বুজলে।

যখন সে চোখ চাইলে, তখন প্রথমেই যে কথা তার মনে উঠল, স্থান ও অবস্থা হিসেবে সেটি বড়োই আশ্চর্যের ব্যাপার বলতে হবে। তার সর্বপ্রথম মনে হল–জাপানি রাইফেলের ধোঁয়া তো খুব বেশি হয় না! কেন একথা তার মনে হল এই নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে জীবনের এই ভীষণ সংকটময় মুহূর্তে, কে তা বলবে?

তারপরই বিমল দেওয়ালের দিকে চেয়ে দেখলে চীনা দু-টি উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। দু জন জাপানি সৈন্য তাদের মৃতদেহের পা ধরে হিঁচড়ে টেনে একপাশে রেখে দিলে। তারা পাশাপাশি পড়ে রইল এমন ভাবে, দেখে বিমলের মনে হল ওরা কোনো ঠাকুরের সামনে উপুড় হয়ে প্রণাম করছে।

মানুষকে মানুষ যে এমন ভাবে হত্যা করতে পারে, বিমল তা আজ প্রথম দেখেছে হাসপাতালে, আর দেখলে এখন।

এবার বিমলের পালা, বিমল ভাবলে।

কিন্তু চেয়ে দেখলে আর চারজন চীনাকে আবার কোথা থেকে নিয়ে এসে জাপানি সৈন্যেরা টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়েছে।

এবারও পূর্বের মতো কথা-কাটাকাটি হল জাপানি অফিসার ও সৈন্যদলের মধ্যে।

তারপর আবার পূর্বের ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি! এই চীনা চারজনও উপুড় হয়ে পড়ল দেয়ালের সামনে আগের দু-জনের মতো।

চীনা ভাষা যদিও-বা কিছু কিছু শিখেছে বিমল, জাপানি ভাষার তো সে বিন্দুবিসর্গ জানে । কেন যে এদের গুলি করে মারা হচ্ছে, কী অপরাধে এরা অপরাধী, কিছু বোঝা গেল না। আর এখানে জাপানিরাই কথাবার্তা বলছে, চীনাদের বিশেষ কিছু বলবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

বিমল ভাবছিল–এই দূর বিদেশে এখনি তার প্রাণ বেরোবে। মা-বাবার সঙ্গে আর দেখা হল না, হয়তো তাঁরা জানতেও পারবেন না যে তার কী হয়েছে। শুধু একখানা চিঠি যাবে তাঁদের কাছে, তাতে লেখা থাকবে, ছেলে তাঁদের মিসিং–খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!… কিন্তু এ্যালিসের কী হল! এ্যালিসের সঙ্গেও আর দেখা হবে না। এ্যালিসকে বড়ো ভালো লেগেছিল। কোথায় যে তাকে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে! বেচারি এ্যালিস! বেচারি মিনি!

কিন্তু বিমলের পালা আসতে বড়ো দেরি হতে লাগল।

দলে দলে চীনা নাগরিকদের টেবিলের সামনে দাঁড় করানো চলতে লাগল। তারপর তাদের হত্যা করাও সমানভাবে চলছে।

মৃতদেহ ক্রমেই স্থূপাকার হয়ে উঠছে।

এ-রকম নিষ্ঠুর হত্যা-দৃশ্য আর দেখা যায় না চোখে।

বিমলকে এইবার দু-জন জাপানি সৈন্য নিয়ে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে। বিমল অনুভব করলে তার ভয় হচ্ছে না মনে–কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে।

জ্বর আসবার আগে যেমন গা বমি-বমি করে, ওর ঠিক তেমনি হচ্ছে শরীরের মধ্যে। মাথাটা যেন হঠাৎ বড়ো হালকা হয়ে গিয়েছে, আর কেমন যেন বমির ভাব হচ্ছে।

জাপানি সামরিক অফিসারটি ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলে–তুমি রাস্তায় কী করছিলে?

বিমল ইংরেজিতে বললে রাস্তায় সে কিছু করেনি। হাসপাতাল থেকে তাকে ধরে এনেছে।

কোন হাসপাতাল?

চীনা রেডক্রস হাসপাতাল?

তুমি সেখানে কী করছিলে?

আমি ডাক্তার। ডিউটিতে ছিলাম, জপানি সৈন্যেরা একজন চীনা রোগীকে অকারণে বেওনেটের খোঁচায়–

পেছন থেকে দু-জন জাপানি সৈন্য ওকে রুক্ষ স্বরে কী বললে, বিমলের মনে হল তাকে চুপ করে থাকতে বলছে।

জাপানি অফিসারটি বললে–থামলে কেন? বলে যাও—

বিমল হাসপাতালের হত্যাকান্ডের কথা সংক্ষেপে বলে গেল।

জাপানি অফিসার চারিপাশের জাপানি সৈন্যদের দিকে চেয়ে জাপানি ভাষায় কী প্রশ্ন করলে। বিমলের দিকে চেয়ে বললে–তুমি সেই সৈন্যকে চিনতে পারবে?

না। অত ভালো করে দেখিনি তার চেহারা, তখন মাথার ঠিক ছিল না, তা ছাড়া জাপানি সৈন্যেরা সবাই আমার চোখে একই রকম দেখায়। দেখতে অভ্যস্ত নই বলে।

তুমি সিঙ্গাপুরের লোক?

আমি ভারতবাসী।

চীনা হাসপাতালে চাকুরি কর?

হ্যাঁ।

সরাসরি এসেছ চীনে?

এ প্রশ্ন করবার কারণ বিমল একটু একটু বুঝতে পারলে। এখানে সে একটা মিথ্যে কথা বললে। এই একমাত্র ফাঁক, এই ফাঁক দিয়ে সে এবারের মতো গলে বেরিয়ে যাওয়ার

চেষ্টা তো করবে। তারপর যা হয় হবে। সে বললে–সরাসরি আসিনি। আন্তর্জাতিক কনসেশনে এসেছিলাম; ব্রিটিশ কনসুলেট অফিসে আমার নাম রেজেস্ট্রি করা আছে।

এই সময় একজন জাপানি সৈন্য কী বললে অফিসারটিকে। তার হাতে তিনটে জরির ব্যাণ্ড, দেখে মনে হয় সে একজন করপোরাল কিংবা কম্প্যানি কমাণ্ডার।

জাপানি অফিসার বিমলের দিকে কুটি করে বললে–তুমি একজন গুপ্তচর।

আমি একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করছি। আমি ডাক্তার। তোমার সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই জানে আমি হাসপাতালে ডিউটিতে ছিলাম, ওরা ধরে এনেছে।

আঙুলের টিপসই দাও দু-টি এখানে।

বিমল দু-খানা কাগজে টিপসই দিলে। তারপর জাপানি অফিসার কী আদেশ করলে জাপানি ভাষায়, ওকে দু-জন জাপানি সৈন্য ধরে নিয়ে গিয়ে বাইরে একটা কামানের গাড়ির ওপর বসালে। চারিধারে বহু জাপানি সৈন্য গিজ গিজ করছে। সকলেই ব্যস্ত, উত্তেজিত। কোথায় যাবার জন্য সকলেই যেন ব্যগ্র উৎসুক।

বিমল দেখলে তাকে এরা ছেড়ে দিলে না। মুক্তি যে দিয়েছে তা নয়। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে? জাপানি ভাষার সে বিন্দুবিসর্গ বোঝে না, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারে । মিনিট পনেরোর মধ্যে ঘড় ঘড় করে কামানের গাড়ি টানতে লাগল একখানা মোটর লরি। ওর দু-দিকে সাঁজোয়া গাড়ি চলেছে সারি দিয়ে।

সাংহাই অতি প্রকান্ড শহর, এর আর যেন শেষ নেই, ঘণ্টা দুই চলবার পরে শহরের বাড়ি-ঘর ক্রমে কমে আসতে লাগল। ফাঁকা মাঠ আর ধানের খেত। চীনদেশের এ অংশের দৃশ্য ঠিক যেন বাংলা দেশ, তবে এখানে কাছাকাছি নীচু পাহাড়শ্রেণি চোখে পড়ে।

কিছুদূরে একটা অনুচ্চ পাহাড়ের ওপারে ঘন ধোঁয়া। রাইফেল ছোঁড়ার শব্দ আসছে।

এক জায়গায় মাঠের মধ্যে পাইন বন। সেখানে কামানের গাড়ি দাঁড়াল। বিমল দেখলে একটি উঁচু ঢালু মতো জায়গা লম্বা সারি দিয়ে জাপানি সৈন্যরা উপুড় হয়ে শুয়ে রাইফেল ধরে ছুড়ছে, এক সঙ্গে পঞ্চাশ-ষাটটা রাইফেলের আওয়াজ হচ্ছে।

www.bengaliebook.com

ওপাশ থেকেও তার জবাব আসছে; এটি যে যুদ্ধক্ষেত্র এতক্ষণ পরে বিমল বুঝতে পারলে! ওদিকে চীনা নাইনথ রুট আর্মি জাপানিদের বাধা দিচ্ছে–চীনা সৈন্যবাহিনী সাংহাই ছেড়ে হটে গিয়েছে বটে, কিন্তু জাপানিদের আর এগোতে দেবে না।

আর একটু পরে বিমল লক্ষ করে দেখলে, পাইন বনের একপাশে গাছের তলায় একরাশ মৃতদেহ জাপানি সৈন্যের। স্ট্রেচারে করে বিমলের চোখের সামনে আরও দু-জন মরা কী জ্যান্ত সৈন্যকে নিয়ে এল, বিমল বুঝতে পারলে না। একটু পরে আহতদের আর্তনাদ কানে যেতেই চিকিৎসক বিমল চঞ্চল হয়ে উঠল। পাশের একজন জাপানি সৈন্যকে বললে পিজিন ইংলিশে–আমাকে ওখানে নিয়ে চলো, আমি ডাক্তার, ওদের দেখব।

সব মানুষের দুঃখই সমান। দুঃখপীড়িত মানুষের জাত নেই–তারা চীনা নয়, জাপানিও নয়। একটু পরে জাপানি অফিসারের সম্মতিক্রমে বিমল হতাহত সৈন্যদের কাছে গেল দেখতে, যদি তার দ্বারা কোনো সাহায্য হয়। যদি মড়ার গাদায় জড়ো করা সৈন্যদের মধ্যে দু-একজন সাংঘাতিক আহত লোক বার হয়–কারণ আর্তনাদ সেই গাদার মধ্যে থেকেই আসছিল।

আসলে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বিমলের কিন্তু মনে হচ্ছিল না যে এটি একটি যুদ্ধক্ষেত্র।

বইয়ে পড়া বা কল্পনায় দেখা যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই।

একটি শান্ত পাইন বন, গোটা তিনেক কামানের গাড়ি, রাইফেল হাতে কতকগুলি সৈন্য উপুড় হয়ে আছে–ওপারে পাহাড়ের ওপর কিছু ধোঁয়া।–

কেবল সম্মুখের হতাহত জাপানি সৈন্যগুলি পরিচয় দিচ্ছে যে বিমল কোনো শান্তিপূর্ণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে নেই যেখানে সে রয়েছে সেখানে মানুষের জীবন-মরণের সঙ্গে সম্পর্ক বড়ো বেশি।

কিন্তু ওষুধপত্র কিছু নেই যা দিয়ে এই সব আহত সৈনিকদের চিকিৎসা চলে। এমনকী খানিকটা আইডিন পর্যন্ত বিমল অনেককে বলেও জোটাতে পারলে না। এদের হাসপাতাল শিবির অনেক দূরে–সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসার কোনো বন্দোবস্ত নেই।

জাপানি সৈন্যেরা কিন্তু দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে পাহাড়ের ওপারে চীনা সৈন্যদের রাইফেল নিস্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। কারণ যে কী, কিছু বুঝলে না।

আবার কামানের গাড়িতে চড়ে সৈন্যবেষ্টিত হয়ে যাত্রা।

এবার জাপানিরা বিমলের সঙ্গে খানিকটা ভালো ব্যবহার করলে, কারণ আহত জাপানি সৈনিকদের ও যথেষ্ট সেবা করেছে। ও যে সাধারণ সৈনিক বা স্পাই নয়, একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার–এই বিশ্বাস জন্মেছে সকলেরই।

পাহাড়ের ওপারে অনেকটা সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র সৈন্যশিবির। ওর মধ্যে ঢুকেই বিমল বুঝতে পারলে, এটা চীনা আর্মির হাসপাতাল–প্রাথমিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত ছিল এখানে–এখন কিছু নেই, চীনা সৈন্য সব সঙ্গে করে নিয়ে পালিয়েছে, কেবল একটা বড়ো দস্তার টব পড়ে আছে–আর কিছু ব্যাণ্ডেজের তুললো। হাসপাতাল শিবির থেকে পঞ্চাশ গজ দুরে এক গাছের তলায় এক চীনা সৈন্যকে পাওয়া গেল–হতভাগ্য গুরুতর আহত। রাইফেলের গুলি বোধ হয় জাপানিদের, তার শরীরের দুই জায়গায় বিধেঁছে–রক্তে তার ইউনিফর্ম ভিজে উঠেছে। একে যে ওর বন্ধুরা কেন শত্রুর হাতে ফেলে পালিয়েছে কিছু বোঝা গেল না।

একজন জাপানি সৈন্য ওর পা ধরে খানিকটা হেঁচড়ে নিয়ে চলল।লোকটার বেশ জ্ঞান রয়েছে–সে যন্ত্রণায় অস্পষ্ট আর্তনাদ করে উঠতেই পেছন থেকে একজন জাপানি অফিসার এগিয়ে গেল তাকে দেখতে।

ওদের মধ্যে উত্তেজিত স্বরে জাপানি ভাষায় কী বলাবলি হল, বিমল বুঝলে না–হঠাৎ অফিসারটি রিভলবার বার করে আহত সৈনিকের মাথায় প্রায় নল ঠেকিয়ে গুলি করলে।

লোকটা যেন রিভলবার ছোঁড়ার সঙ্গেসঙ্গে নেতিয়ে পড়ল। ওর সকল যন্ত্রণার অবসান হয়েছে।

বিমল শিউরে উঠল–চোখের সামনে এ-রকম নিষ্ঠুর হত্যা দেখতে সে এখনওতেমন অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। মাইল তিন দূরে একটা চীনা গ্রাম–যুদ্ধক্ষেত্রের বাঁ-দিক ঘেঁষে। ডান দিকে একটি অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণির দিকে জাপানি অফিসারটির ফিল্ড গ্লাস দিয়ে দেখছে সবাই, সেদিকে আঙুল দিয়ে কী দেখাচ্ছে–বিমল বুঝলে ওইপাহাড়টা বর্তমানে চীনা নাইনথ রুট আর্মির দ্বিতীয় ঘাঁটি। প্রথম ঘাঁটি ছিল পূর্বোক্ত পাইন বনের সামনের পাহাড়ে–তা গিয়েছে।

একস্থানে একদল জাপানি সৈন্য গোল হয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। তাদের পাশ দিয়ে বিমলদের দল কামানের গাড়ি নিয়ে চলে গেল। ওরা যেন খুব উত্তেজিত হয়ে কী বলাবলি করছে, বিমল বুঝতে পারলে না। একজন পিজিন ইংলিশ জানা জাপানি সৈন্যকে জিজ্ঞেস করলে...ওখানে কী হচ্ছে? সৈন্যটি বললে– শোনোনি তুমি? সাংহাই শহর এখন আমাদের হাতে। আজ সকালে আমাদের হাতে এসেছে।

অত বড়ো সাংহাই শহর তোমাদের হাতে সবটা এসেছে?

সব। ওরা এইমাত্র ফিল্ড টেলিফোনে খবর পেয়েছে।

যুদ্ধ হল কখন?

কাল সারারাত প্রায় দু-শো বহুবার প্লেন বোমা ফেলেছে–শুনছি বিস্তর লোক মরেছে। সাংহাইতে–

সকলেই সাধারণ নাগরিক বোধ হয়?

বেশিরভাগ। হাজার দুই তো শুধু চা-পেইতেই মরেছে–আর শুনছি কনসেশনে বোমা ফেলে ছ-শো পলাতক চীনাকে মারা হয়েছে। ভয়ানক যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে–হবেই তো– আমাদের বাধা দেবার কেউ নেই। সাংহাই কী, সারা এশিয়া আমরা দখল করব– তোমাদের ভারতবর্ষ তো বটেই। দেখে নিও তুমি–নাও, এগিয়ে চলো।

বিমল ভাবছিল সুরেশ্বর কী বেঁচে আছে। বোধ হয় না। চা-পেই পল্লির অত্যন্ত কাছে চ্যাং সো লিন অ্যাভিনিউতে চীনা রেডক্রস হাসপাতাল। জাপানি বম্বারগুলির বিশেষ দৃষ্টি হাসপাতালের ওপর। কাল রাত্রেই সুরেশ্বরের ডিউটি থাকবার কথা। সম্ভবত হাসপাতাল গুঁড়িয়ে দিয়েছে– রোগী, ডাক্তার, নার্সসুদ্ধ। ভাগ্যে এ্যালিস আর মিনি ওখানে ছিল না!

কিন্তু আন্তর্জাতিক কনসেশনে বোমা ফেলে আশ্রয়হীন চীনা নর-নারীদের মেরেছে, একথাটা বিমলের ভালো বিশ্বাস হল না। আন্তর্জাতিক কনসেশনে বোমা ফেলতে সাহস করে কখনো? ওটা নিতান্ত বাজে কথা বলছে।

ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক কনসেশনের সম্পর্কে বিমলের এ অলৌকিক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব দূর হয়েছিল–সাংহাই অধিকার করার পূর্বে ও পরে জাপানি বম্বার প্লেনগুলি সে কনসেশনের পবিত্রতা মানেনি–এ সংবাদ বিমল আরও ভালো জায়গা থেকে এর পরে শুনেছিল।

পথের মধ্যে একটা চীনা গ্রাম। বড়ো বড়ো ভুট্টাখেতের মধ্যে। তখন সন্ধ্যা হবার বেশি দেরি নেই। পূর্বোক্ত পাহাড় ও পাইনবন থেকে অন্‌তত পাঁচমাইল তখনআসা হয়েছে। জাপানি সৈন্যের একটা দল গ্রামটা দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠল–এবং সবাই তক্ষুনি হামাগুড়ি দিয়ে মাটিতে প্রায় বুক ঠেকিয়ে, চুপি চুপি অগ্রসর হতে লাগল গ্রামখানার

দিকে। বিমল শুধু ভাবছিল, ভগবান করেন–গ্রামটাতে লোক না থাকে–সব যেন পালিয়ে গিয়ে থাকে।

কিন্তু তা হল না। এ গ্রামের লোক যুদ্ধের বিশেষ কোনো খবর রাখত না–সাংহাই থেকে অন্তত পনেরো-ষোলো মাইল দূরে এই গ্রামখানা। এরা বেশ নিশ্চিন্ত ছিল যে চীনা নাইনথ রুট আর্মি তাদের রক্ষা করছে। হঠাৎ যে নাইনথ-রুট আর্মি ঘাঁটি ছেড়ে দিয়েছে–তা ওরা সম্ভবত জানত না।

জাপানি সৈন্যরা গ্রামখানাকে আগে চুপি চুপি গোল করে ঘিরে ফেললে। গ্রামে অনেকগুলো সাদা সাদা খোলার ঘর, খড়ের ঘর। শস্যের গোলা, দোকানপত্রও আছে। বেশ করে ঘেরার পরে জাপানিরা হঠাৎ একযোগে ভীষণ পৈশাচিক চিৎকার করে উঠল। সঙ্গেসঙ্গে নিদ্রিত নর-নারী ঘুম ভেঙে বাইরে এসে অনেকে দাঁড়াল–অনেকে ব্যাপারটা কী না বুঝতে পেরে বিস্ময় ও কৌতূহলের দৃষ্টিতে জানলা খুলে চেয়ে দেখতে লাগল।

তারপর যে দৃশ্যের সূচনা হল তা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি অমানুষিক। বিমলের চোখের সামনে বর্বর জাপানি সৈন্যেরা নিরীহ গ্রামবাসীদের টেনে টেনে ঘর থেকে বার করতে লাগল, এবং বিনা দোষে বেওনেটের কিংবা বন্দুকের কুঁদোর ঘায়ে তার মধ্যে সাত-আটজনকে একদম মেরে ফেললে। ছুতো এই যে, তারা নাকি বাধা দিয়েছিল। বাকিগুলিকে এক জায়গায় জড়ো করে দাঁড় করিয়ে রাখলে–চারিধারে বেওনেট-চড়ানো রাইফেল হাতে জাপানি সৈন্যের দল।

দু-তিনখানা খড়ের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে। দুটো ছোটো ছোটো বাছুরকে ভয় দেখিয়ে মজা করতে লাগল, একটা পিচ গাছের ডালগুলি অকারণে ভেঙে গাছটাকে ন্যাড়া করে দিলে। তবুও বিমল সবটা দেখতে পাচ্ছিল না–একে অন্ধকার, গ্রামটাও লম্বায় বড়ো, ওদিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে সে জানে না তার সামনে যেগুলি ঘটছে সেগুলি সে কেবল জানে। তবে নারী ও শিশুকণ্ঠের চিৎকার শুনে মনে হচ্ছিল, ওদিকের জাপানি সৈন্যেরা ঠিক বুদ্ধদেবের বাণী আবৃত্তি করছে না। মিনিট কুড়ি-পঁচিশ এমনি চলল– বেশিক্ষণ ধরে নয়। তখন অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে এসেছে, কেবল জ্বলন্ত ঘরের চালের আলোয় সামনেটা আলোকিত।

হঠাৎ বিমলের যেন হুঁশ হল– সে তার আশে-পাশে চেয়ে দেখলে তার খুব কাছে। কোনো জাপানি সৈন্য নেই–লুঠপাঠের লোভে সবাই গ্রামের ঘর-দোরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে জটলা করছে।

www.bengaliebook.com

বিমল একবার পিছনের দিকে চাইলে– সেদিকে একখানা কামানের গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়ির কাছে সৈন্য নেই। গাড়িখানা থেকে পঞ্চাশ গজ আন্দাজ দূরে একটি প্রাচীন সহমরণের স্মৃতিস্তম্ভ। চীনদেশের অনেক পাড়াগাঁয়ে সহমৃতা বিধবার এমনপুরোনো আমলের স্মৃতিস্তম্ভ সে আরও দু-একটি দেখেছে, ততদূর পর্যন্ত বেশ দেখা যাচ্ছে অগ্নিকান্ডের আলোয়, কিন্তু তার ওপারে অন্ধকার–কিছু দেখা যায় না।

বিমল আস্তে আস্তে পিছনে হটতে হটতে দশ-বারো পা গিয়ে হঠাৎ পেছনে ফিরে ছুট দিয়ে সহমরণের স্মৃতিস্তম্ভটার আড়ালে একটি অন্ধকার স্থানে এসে দাঁড়াল।

ওর বুক ঢিপ ঢিপ করছে, যদি জাপানিরা তাকে এখন ধরে তবে এখুনি গুলি করে মারবে। কিন্তু ওদের হাতে বন্দি হয়ে এভাবে থাকার চেয়ে মৃত্যুপণ করেও মুক্তির চেষ্টা তাকে করতে হবে।

স্মৃতিস্তম্ভটার গায়ে একটা ডোবা। অন্ধকারের মধ্যেও মনে হল ডোবাটায় বেশ জল আছে। বিমল তাড়াতাড়ি ডোবার জলে নামল–তার কেমন মনে হল জলে নেমে সে যদি গলা ডুবিয়ে থাকে, তবেই সব চেয়ে নিরাপদ–ডাঙায় ছুটে পালাবার চেষ্টা করলে বেশিদূর যেতে না-যেতেই সে ধরা পড়বে।

এই ডোবায় নামবার জন্যেই যে এ যাত্রা বেঁচে গেল সেটি সে খানিকটা পরেই বুঝতে পারলে।

অল্পক্ষণ–বোধ হয় দশ-বারো মিনিটের পরেই ভীষণ চিৎকার ও বহু রাইফেলের সম্মিলিত আওয়াজ শোনা গেল। খুব একটা হইচই দুপ দাপ পালানোর শব্দ, আবার চেঁচামেচি–একটা ঘোর বিশৃঙ্খলার ভাব!

বিমল তখন ডোবার জলে গলা ডুবিয়ে বসে আছে। যদি ডাঙায় থাকত তবে অন্ধকারে ছুটন্ত রাইফেলের গুলিতে হয়তো তার প্রাণ যেত।

ব্যাপারটা কী? বিমল দেখলে সেই জাপানি কামানের গাড়িটা ঘিরে একটা খন্ডযুদ্ধ ও হাতাহাতি আরম্ভ হয়েছে সহমরণের স্মৃতিস্তম্ভটার ওপারে। হ্যাঁণ্ডগ্রেনেড ফাটবার ভীষণ আওয়াজে হঠাৎ সমস্ত জায়গাটা যেন কেঁপে উঠল। একটি–দুটি–তিনটি। জাপানি কামানের গাড়ির কাছ থেকে জাপানি সৈন্যেরা হটে যাচ্ছে একটা বাগানের দিকে।

বিমল এবার ব্যাপারটা কিছু কিছু বুঝলে। চীনা সৈন্যের একটা দল জাপানিদের অতর্কিতে আক্রমণ করেছে। জাপানিরা ফিল্ডগানগুলি একেবারে ছুঁড়তে পারলে না।

দু-টির একটিও না। চীনারা বুদ্ধি করে আগেই সে দু-টি কামানই ঘেরাও করে দখল করলে। চীনা সৈন্যের এই দলটা হ্যাঁণ্ডগ্রেনেড ছুঁড়ে জাপানিদের দলের জটলা ভেঙে দিলে।

কিছুক্ষণ পরে রাইফেলের ও হ্যাঁণ্ডগ্রেনেডের আওয়াজ থেমে গেল। জাপানিরা কামানের গাড়ি ও বন্দিদের ফেলে পালিয়েছে। বিমল বেশ দেখতে পেলে কাছাকাছি কোথাও জাপানি সৈন্য একটিও নেই। কাদামাখা পোশাকে সতর্কতার সঙ্গে সে ধীরে ধীরে ডোবার জল থেকে উঠল ডাঙায়।

একজন সৈনিকের চড়া আওয়াজ তার কানে গেল– কে ওখানে?

বিমল আশ্চর্য হল এ পুরুষের গলা নয়– মেয়েমানুষের মতো সরু গলা। বিমল কথার উত্তর দেবার আগে দু-জন রাইফেলধারী চীনা সৈনিক ওর দিকে এগিয়ে এল ইলেকট্রিক টর্চ হাতে। তারা ওকে দেখে যেমন অবাক হল, বিমলও ওদের দেখে তেমনি অবাক হয়ে গেল।

এরা পুরুষ মানুষ নয়, দু-জনেই মেয়ে; বয়েসও বেশি নয়। কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে। বেশ সুশ্রী দু-জনেই–সৈন্যবিভাগের আট-সাঁট খাকি পোশাকে এদের দেহের লাবণ্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।

তারা বিমলকে ধরে নিয়ে গেল গ্রামের সদর রাস্তার ওপরে।

অবাক কান্ড! সকলেই মেয়ে সৈনিক! এদের মধ্যে পুরুষ মানুষ নেই একজনও। এই সুশ্রী তরুণীর দল এতক্ষণ হ্যাঁণ্ডগ্রেনেড ছুড়ছিল এবং এরাই জাপানি ফিল্ড গান দু-টি ঘেরাও করে দখল করেছে।

বিমলের মনে পড়ল চীনা নাইনথ-রুট আর্মির সঙ্গে একটি নারী বাহিনি আছে সে সাংহাই চীনা রেডক্রস হাসপাতালে শুনেছিল বটে।

এরাই সেই চীনা মেয়ে-যোদ্ধার দল।

এদের কমাণ্ডান্ট কিন্তু মেয়ে নয়–পুরুষ। একটি পাইনকাঠের পুরোনো ভাঙা টেবিলের সামনে সম্ভবত একটা উপুড় করা কলসি বা ওইরকম কোনো হাস্যকর জিনিস পেতে খুব লম্বা গোঁপওয়ালা কমাণ্ডান্ট বসেছিলেন। মেয়েরা বিমলকে ধরে নিয়ে গেল সেখানে।

বিমলের মনে হল সমগ্র নারী বাহিনীর মধ্যে এই লোকই ইংরেজি জানে এবং বেশ ভালো আমেরিকান টানের ইংরেজি বলে।

বিমলের আপাদমস্তক ভালো করে দেখে প্রশ্ন করলে–তুমি জাপানিদের লোক?

না। আমি চীনা হাসপাতালের ডাক্তার।

কোথাকার হাসপাতাল?

সাংহাইয়ের রেডক্রস হাসপাতাল। আমাকে ওরা বন্দি করে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল।

তুমি কোন দেশের লোক?

ভারতবর্ষের। চীনা মেডিকেল ইউনিটের আমি সভ্য।

কম্যাণ্ডান্ট বিস্ময়ের সুরে বললে–ও! তা ডোবায় জলে কী করছিলে? বিমল লজ্জিত হল। এতগুলি মেয়ের সামনে।

বললে–লুকিয়ে ছিলুম। ওদের অসতর্ক মুহূর্তে ওদের হাত থেকে পালিয়ে ডোবার জলে লুকিয়েছিলুম। তার পর হঠাৎ হ্যাঁণ্ডগ্রেনেডের আওয়াজ আর চিৎকার শুনলাম, তখনই ভাবলাম চীনা সৈন্য আক্রমণ করেছে ওদের।

কথাবার্তা চলছে এমন সময়ে গ্রামের পথে কী একটা গোলমাল উঠল। কমাণ্ডান্টকে ঘিরে যারা ছিল, তারা চমকে উঠে সেদিকে ছুটতে লাগল। আবার কি জাপানি সৈন্যের দল আক্রমণ করেছে?

বিমল চেয়ে দেখল জনকয়েক সৈন্য যেন কাউকে ধরে আনছে–তাদের পেছনে পেছনে অনেক সৈন্য মজা দেখতে আসছে।

ব্যাপার কী? হয়তো কোনো জাপানি সৈন্য ওদের হাতে ধরা পড়েছে, তাকে সকলে মিলে ধরে আনছে–নিশ্চয়ই।

কিন্তু দলটি কমাণ্ডান্টের কাছে এসে পৌঁছে যখন ওদের প্রথামতো সামরিক অভিবাদন করে দু-জন বন্দিকে এগিয়ে নিয়ে দাঁড় করালো কম্যাণ্ডান্টের সামনে–বিমল চমকে উঠে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। কারণ কিছুক্ষণ পরে তার মুখ দিয়ে অস্‌ফুট স্বর বেরোলো–এ্যালিস! মিনি! সামনের শীর্ণকায়া মূর্তি দু-টি এ্যালিস

ও মিনি ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু ওদের হাত পা বাঁধা–মুখে কাপড় দিয়ে বাঁধা। এমন শক্ত করে বাঁধা যে ওদের কথা বলবার উপায় নেই।

ভয়ানক রাগ হল বিমলের এক মুহূর্তে এই চীনা নারী বাহিনীর ওপর। মেয়ে হয়ে মেয়ের ওপর এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার! ওদের এমন করে বেঁধে আনার অর্থ কী? ওরা ছিলই-বা কোথায়?

কম্যাণ্ডান্ট উত্তেজিত সুরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল। ইতিমধ্যে এ্যালিস ও মিনির হাত-পা মুখের বাঁধন খুলে দেওয়া হল। ব্যাপারটি ক্রমশ যা জানা গেল তা হল এই

চীনা নারী সৈন্যেরা এদের গ্রামের একটি ঘরের মধ্যে অন্ধকার কোণে এইঅবস্থাতেই পায়। বাইরে থেকে ঘরের দরজায় তালা দেওয়া ছিল–কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে অস্পষ্ট গোঙানির আওয়াজ সন্দেহ করে ওরা দরজা ভেঙে দেখতে পায় এদের। ওরা বুঝতে পেরেছে যে এরা ইউরোপীয় বা আমেরিকান মহিলা। কিন্তু চীনের এইসুদূর পাড়াগাঁয়ে একা অন্ধকার ঘরের কোণে এদের কে এ অবস্থায় এনে ফেলেছে তা না বুঝতে পেরে সবাই মহাবিস্ময়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

হঠাৎ বিমল বলে উঠল–এ্যালিস! মিনি!

প্রথমে চমকে উঠে ওর দিকে চাইলে এ্যালিস। বিমলকে দেখে সে যেন প্রথমটা চিনতে পারলে না–তারপর প্রায় ছুটে ওর কাছে এসে বিস্মিত চকিত আনন্দভরা কণ্ঠে বললে–তুমি এখানে!

সঙ্গেসঙ্গে মিনিও ছুটে এল। মিনির চেহারাটা বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছে নানা কষ্টে, উদবেগে, এবং খুব সম্ভবত অনাহারেও বটে। সে বললে, তোমার বন্ধু কই?

.

ঘণ্টা কয়েক পরে।

একটা রিচ গাছের তলায় বসে মিনি, এ্যালিস ও বিমল কথা বলছিল। এখনও রাত আছে, তবে পূর্ব আকাশে শুকতারা উঠেছে–ভোর হওয়ার বেশি দেরি নেই।

মিনি ও এ্যালিস তাদের গল্প বলে যাচ্ছিল। ওদের ভালো করে খেতে দেওয়া হয়েছে, কারণ ওদের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল পেটভরে খাওয়া ওদের অদৃষ্টে অনেকদিন ধরে জোটেনি।

www.bengaliebook.com

বিমল বললে–এখানে তোমরা কী করে এলে?

এ্যালিস বললে–এখনও ঠিক গুছিয়ে বলতে পারব না, কিন্তু বড় খুশি হয়েছি তোমায় দেখে, বিমল। আমরা তো আশঙ্কা করছিলাম জাপানিরা আক্রমণ করেছে–এইবার ঘর জ্বালিয়ে আমাদের বন্দি অবস্থায় পুড়িয়ে মারবে–কে আর উদ্ধার করবে আমাদের? আর আমাদের অস্তিত্ব জানেই বা কে?

কবে তোমরা এ গ্রামে এসেছ?

আজ তিন দিন হল খুব সম্ভব–কারণ দিনরাত্রির জ্ঞান আমাদের বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

কে তোমাদের আনে?

কয়েকজন চীনা দস্যু।

সাংহাইয়ের চর আড্ডায় তোমাদের নিয়ে গিয়েছিল ধরে?

এ্যালিস বিস্ময়ের সুরে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে–তুমি কী করে জানলে? বিমল হেসে বললে–আমি আর সুরেশ্বর সেই চড়ুর আড্ডাতে যাই তোমাদের খুঁজতে। কিন্তু বড়ো বিভ্রাট বেধে গেল সে রাত্রে। জাপানি বম্বারগুলি সেইরাত্রে ভীষণ বোমা বর্ষণ শুরু করলে। মিনি বললে, আমরা খুব জানি। আমরা তখন হাতমুখ বাঁধা অবস্থায় একটি গোরুর গাড়ির মধ্যে শুয়ে। একটি বোমা তো আমাদের গাড়ির পাশে পড়ল।

এ্যালিস বললে–তারপর ওরা আমাদের নানা জায়গায় ঘোরালে। দশ হাজার ডলার মুক্তিপণ না দিলে আমাদের ছাড়বে না। দেশে বাপ-মায়ের কাছে চিঠি লিখবে বলে ঠিকানা চেয়েছিল–আমরা দিইনি। আজ ওরা আমাদের শাসিয়েছিল জাপানি সৈন্যেরা গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে–ঠিকানা যদি না দিই তবে ঘরের মধ্যে বেঁধে রেখে পালাবে–আমরা নিঃশব্দে পুড়ে মরব। করেছিলও তাই। চীনা মেয়ে সৈন্যেরা না এলে জাপানিরা গ্রাম জ্বালিয়ে দিত। আমরাও পুড়ে মরতাম।

বিমল বললে–কী সর্বনাশ!

এ্যালিস বললে–সর্বনাশ আর কী, পুড়ে মরতাম এর আর সর্বনাশ কী? কতই তো মরছে! কিন্তু তুমি এখানে কী করে এলে বিমল?

আমাকে হাসপাতাল থেকে জাপানিরা বন্দি করে এনেছিল। আমি নাকি স্পাই। এতদিন গুলি করেই মারত যদি একথা ওদের না বলতুম যে ব্রিটিশ কনসুলেট অফিসে আমার নাম রেজেস্ট্রি করা আছে।

মিনি বললে–সুরেশ্বর কোথায় গেল একটা খোঁজ করতে হয়। আর আমেরিকান কনসুলেটে আমাদের বিষয়ে একটা খবর দিতে হয়–চলো কম্যাণ্ডান্টকে বলি।

জনকয়েক তরুণী চীনা মেয়ে-সৈন্য ওদের হাসিমুখে ঘিরে দাঁড়াল। এদের হাস্যদীপ্ত সুন্দর চেহারা বিমলের বড়ো ভালো লাগল, এমন একটি জিনিস নতুন দেখছে সে–বহুশতাব্দীর জড়তা দূর করে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নারী–রণক্ষেত্রের নিষ্ঠুরতা, কঠোরতার মধ্যে। দেশের দুর্দিনে দেশমাতৃকার সেবাযজ্ঞে তারা আজ মস্ত বড় হোতা–মিথ্যে জড়তা, মিথ্যে লজ্জা-সঙ্কোচ দূর করে ফেলেছে টেনে।

একটি মেয়ে ইংরেজিতে বললে–তোমরা হ্যাং-চাউতে রাজকুমারী তাং-এর দেউল দেখেছ?

এ্যালিস বললে–না, সে কী?

পাঁচশো বছর আগে মিং রাজবংশের একজন রাজকুমারী ছিলেন তাং। তাঁর পুণ্যচরিত্র এখনও আমাদের দেশের লোকের মুখে মুখে আছে। এখান থেকে বেশি দূর নয়–দেখে যেও।

বিমল বললে–তুমি বেশ ইংরেজি বলতে পার তো?

মেয়েটি এমন হাসলে যে তার তেরচা চোখ দুটি বুজে গিয়ে দুটো কালো রেখার মতো দেখাতে লাগল।

ভালো ইংরেজি বলছি? তবুও এ ইয়াংকি ইংরেজি। মিশনারি স্কুলে পাঁচ বছর পড়েছিলুম এক সময়ে। ইংরেজি গান পর্যন্ত গাইতে পারি–শুনবে?

হঠাৎ বিউগল বেজে উঠল। সবাই ব্যস্ত হয়ে কমাণ্ডান্টের তাঁবুর দিকে চলল। এখনি মার্চ শুরু করতে হবে। খবর পাওয়া গিয়েছে জাপানিদের বড়ো একটি দল এখানে আসছে।

বিমল বাঁ-দিকে চেয়ে দেখলে।

একটা অনুচ্চ পাহাড়ের মতো লম্বা ঢিবির আড়াল থেকে মাঝে মাঝে যে সাদা ধোঁয়া বার হচ্ছে–আর সঙ্গেসঙ্গে ফটফট শব্দ হচ্ছে। শব্দটা অনেকটা যেন বিমলদের দেশের লিচু বাগানে পাখি তাড়াবার জন্যে চেরা বাঁশের ফটাফট আওয়াজের মতো।

রাইফেল ছোঁড়ার শব্দ। আধুনিক যুদ্ধে ব্যবহৃত রাইফেলে শব্দ হয় খুব কম–বিমল জানত।

সবাই বললে–মাথা নীচু করো–মাথা নীচু করো—

জাপানি সৈন্যরা আক্রমণ করে ওই ঢিবিটাতে আড়াল নিয়েছে–কিন্তু হয়তো এখুনি বেওনেট চার্জ করবে কিংবা হ্যাঁণ্ডগ্রেনেড নিয়ে ছুটে আসবে।

চক্ষের নিমেষে সবাই উপুড় হয়ে শুয়ে রাইফেলের মুখ ঢিবিটার দিকে ফেরালে। একটি মেয়ে হঠাৎ অস্পষ্ট চিৎকার করে উপুড় অবস্থা থেকে চিৎ হয়ে গেল–তার হাত থেকে বন্দুকটি ছিটকে গিয়ে পড়ল আর একটি মেয়ের পিঠের ওপরে– সে কিছু দূরে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল বন্দুক বাগিয়ে। এ্যালিস ছুটে উঠে গিয়ে মেয়েটির মাথা নিজের কোলে তুলে নিলে–আশপাশের মেয়েরা বললে–মাথা নীচু–মাথা নীচু–শুয়ে পড়ো—

বিমল শঙ্কিত চোখে অল্পক্ষণের জন্যে এ্যালিসের দিকে চেয়ে দেখলে–তারপর সেও উঠে গিয়ে এ্যালিসের পাশে বসল। আহত মেয়ে-সৈনিকের হাতের নাড়ি দেখে বললে–এ শেষ হয়ে গিয়েছে। এঃ এই দ্যাখো গলায় লেগেছে গুলি–তোমার কাপড় যে রক্তে ভেসে গেল।

এ্যালিসকে একরকম জোর করে টেনে বিমল তাকে আবার উপুড় করে শোয়ালে। বিমল ভাবছিল, এখুনি যদি দুর্দান্ত জাপানি গ্রেনেডিয়ারেরা হ্যাঁণ্ডগ্রেনেড নিয়ে ছুটে আসে ঢিবিটা ডিঙিয়ে, তবে এই শায়িতা নারী-সৈনিকের দল একটিও টিকবে না। জাপানি হ্যাঁণ্ডগ্রেনেডের বিস্ফোরণের ফল অতি সাংঘাতিক, এদের কম্যাণ্ডান্ট কী ভরসায় এদের এখনও শুইয়ে রেখেছে? মরবে তো সবগুলিই মরবে। যা করে করুক, ওদের সৈন্য ওরা বাঁচাতে হয় বাঁচাক, নয় তো যা হয় করুক। কিন্তু মিনি ও এ্যালিসের জীবন আবার বিপন্ন হল।

ফটাফট–ফটাফট—

আবার একটি অস্ফুট শব্দ। তারপর বিমল চেয়ে দেখলে চিৎকার না করেও সারির মাঝামাঝি দু-টি মেয়ে উপুড় অবস্থাতেই মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে। হাতের শিথিল মুঠিতে তখনও রাইফেল ধরাই রয়েছে। তার মধ্যে একটি মেয়ের মুখ থেকে রক্ত বার

হয়ে সামনের মাটি রাঙা হয়ে গিয়েছে। আর একটি মেয়েও দেখতে দেখতে মুখ গুঁজে পড়ে গেল। আঃ– কী ভীষণ হত্যাকান্ড! পুরুষদের এ-রকম অবস্থায় দেখলে সহ্য করা হয় তো যায়–কিন্তু এই ধরনের নারীবলির দৃশ্যটা বিমলের কাছে অতি করুণ ও অসহনীয় হয়ে উঠল।

বিমল বললে–এ্যালিস। কমাণ্ডান্টটি কেমন লোক? এদের দাঁড়িয়ে খুন করাচ্ছে কেন? হঠে যাবার অর্ডার না দেওয়ার মানে কী? জাপানিরা বেওনেট কি হ্যাঁণ্ডগ্রেনেড চার্জ করলে একজনও বাঁচবে?

এ্যালিস বিমলের পাশেই উপুড় হয়ে শুয়ে–তার ওদিকে মিনি।

মিনি বললে–কমাণ্ডান্টের এ-রকম ব্যবহারের নিশ্চয়ই কোনো মানে আছে। মানে কী আছে তা জানবার আগেই আরও দু-টি মেয়ে মুখ খুঁজড়ে পড়ে গেল–এদের এই নিঃশব্দ মৃত্যু বিমলের কাছে বড়ো মর্মস্পর্শী বলে মনে হল। হঠাৎ একটা লম্বা কাশীর পেয়ারার আকারে বস্তু শায়িতা মেয়েদের সারির অদূরে এসে পড়ল–বিমল ও এ্যালিস দু জনেই বলে উঠল–গ্রেনেড!

কিন্তু হ্যাঁণ্ডগ্রেনেডটা ফাটল না। বোধ হয় এবার জাপানিরা চার্জ করবে। এ্যালিস ও মিনির জন্যে বিমল শঙ্কিত হয়ে উঠল।

ঠিক সেই সময় কমাণ্ডান্ট ওদের হঠবার অর্ডার দিলে।

পেছনের সারি শুয়ে-শুয়েই পিছু দিকে হঠতে লাগল। সামনের সারিগুলি ততক্ষণ রাইফেল বাগিয়ে তাদের রক্ষা করছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সামনের সারিও হঠতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে জাপানিরা চার্জ করলে। দলে দলে ওরা ঢিবিটা পেরিয়ে বানজাই বলে ভীষণ বাজখাঁই চিৎকার করতে করতে ছুটে এল–এদিকে নারী-বাহিনীর সব বন্দুকগুলি একসঙ্গে গর্জন করে উঠল। এখানে-ওখানে জাপানি সৈন্য ধুপ-ধাপ করে মুখ থুবড়ে পড়তে লাগল। তবুও ওদের দল এগিয়ে আসছে।

সব পেছনের সারি উঠে দাঁড়িয়ে একযোগে সাত-আটটা হ্যাঁণ্ডগ্রেনেড ছুড়ল, চার-পাঁচটা ফাটল। আরও কতকগুলি জাপানি সৈন্য মাটিতে পড়ে গেল। তিন জন মাত্র জাপানি এদের দলের মধ্যে এসে পৌঁছেছিল। তাদের মধ্যে দু-জন বেওনেটের ঘায়ে সাংঘাতিক আহত হল–বাকি একজনের মাথায় গুলি লেগে সাবাড় হল।

ততক্ষণ নারী-বাহিনী প্রায় এক-শো-দেড়-শো গজ দূরে চলে গিয়েছে। এতদূর থেকে হ্যাঁণ্ডগ্রেনেড কোনো কাজে আসবে না– কেবল কার্যকরী হতে পারে মিলস বম্ব জাতীয় বোমা। সে কোনো দলের কাছেই নেই, বেশ বোঝা গেল।

কমাণ্ডান্ট বিমলকে ডেকে বললেন–এ-রকম কেন করেছি, আপনি বোধ হয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন। এর কিছু দূরে মিং-চাউ এর রেলস্টেশন। দু-টি সৈন্যবাহী ট্রেন পরপর চলে যাবার কথা। জাপানিরা রেলস্টেশন আক্রমণ করত। আমি ওদের বাধা দিয়ে এখানে আটকে রাখলাম। টাইম অনুসারে ট্রেন দু-টি চলে গিয়েছে। এখনআর আমার সৈন্যদের মৃত্যুর সম্মুখীন করা অনাবশ্যক। জাপানিরাও তা বুঝেছে, ওরাও আর আসবে না। ওদের লক্ষ্যস্থল আমরা নই– সেই ট্রেন দু-খানা।

কিন্তু এরোপ্লেন যদি বোমা ফেলে?

আমার ঘাঁটি পার করে দিলাম নিরাপদে–তারপর অন্য এলাকার লোক গিয়ে বুঝুক সে কথা।

মিং-চাউয়ের রেলস্টেশন পৌঁছে সবাই খাওয়া-দাওয়া করবার হুকুম পেলে। বিমল ব্যস্ত হয়ে পড়ল মিনি ও এ্যালিসকে কিছু খাওয়াতে। খাবার কিছুই নেই। অন্তত সভ্য খাদ্য কিছু নেই। কমাণ্ডান্টকে বলে কিছু চাল জোগাড় করে একটা গাছতলায় এ্যালিস একটি পুরোনো সসপ্যানে ভাত চাপিয়ে দিলে তিনজনের মতো।

বেলা প্রায় বারোটা। রৌদ্র বেশ প্রখর, কিন্তু গরম নেই, বেশ শীত।

ভাত প্রায় হয়ে এসেছে, এমন সময় দলে দলে ছোট্ট শীর্ণকায় ছেলে-মেয়ে গাছতলায় নীরবে এসে দাঁড়াল। তারা ক্ষুধার্তের ব্যগ্র দৃষ্টিতে সসপ্যানের দিকে চেয়ে রইল। জনৈক মেয়ে সৈনিক বললে–এরা আশপাশের গ্রামের দুর্ভিক্ষপীড়িত ছেলে-মেয়ে; আমাদের দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ চলছে। ওরা খাবার লোভে এসেছে।

এ্যালিস বললে–পুওর লিটল ডিয়ারস! … ওদের কী খেতে দিই, বিমল?

বিমল মুশকিলে পড়ে গেল। নিজের খাওয়ার জন্যে নয়–মিনি এ্যালিস কত দিন পেট ভরে খায়নি বলেই ওদের খাওয়াতে ব্যর্থ ছিল। নিজে না হয় না খাবে, কিন্তু এ্যালিস যেমন মেয়ে নিজের মুখের ভাত সব এক্ষুনি তুলে দেবে এখন এদের।

সুখের বিষয় একটা সমাধান হল। ওরা চীনা ছেলে-মেয়ে, চীনা খাবার খেতে আপত্তি নেই। অন্য অন্য মেয়ে-সৈনিকরা ওদের দেশীয় খাদ্য কিছু দিলে। তারা চলে গেল তাই খেয়ে। এ্যালিসের ইচ্ছে ওদের মধ্যে একটা ছোট্ট ছেলে নিয়ে যায়। বললে–বিমল, বলো

না ওদের মধ্যে কেউ আমার সঙ্গে যাবে। আমি খুব যত্ন করব। বিমল হাসলে, তা কী কখনো হয়?

একটু পরে একখানা ট্রেন এল। তাতে সব খোলা ট্রাক, কয়লার গাড়ির মতো। কম্যাণ্ডান্টের আদেশে সবাই তাতে উঠে পড়ল। ট্রেনের গার্ডের মুখে শোনা গেল জাপানিরা এখান থেকে বাইশ মাইল ডাউন লাইনে একখানা সৈন্যবাহী ট্রেন এরোপ্লেন থেকে বোমা মেরে উড়িয়ে চুরমার করে দিয়েছে।

ট্রেন ছাড়ল। গার্ড বললে–ভয়ানক বিপজ্জনক অবস্থা। ওরা প্রত্যেক সৈন্যবাহী ট্রেনের ওপর কড়া লক্ষ্য রেখেছে। পৌঁছে দিতে পারব কিনা নিরাপদে তার ঠিক নেই।

মাইল ত্রিশেক দু-ধারে ফাঁকা মাঠ, ধানের খেত, গমের খেতের মধ্য দিয়ে ট্রেন চলল। বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে, রোদ নেই। মাঠে ঘন ছায়া পড়ে এসেছে। এমন সময় একটি পরিচিত আওয়াজ শুনে বিমলের বুকের মধ্যেটা কেমন করে উঠল। মুখ উঁচু করে দেখতে গিয়ে দেখলে ট্রেনের সবাই মুখ তুলে চেয়ে রয়েছে। অনেকগুলি এরোপ্লেনের সম্মিলিতি ঘড় ঘড় আওয়াজ। ট্রেন যেন গতি বাড়িয়ে দিয়ে জোরে চলতে লাগল।

মিনি বললে–ওই দেখো বিমল এরোপ্লেনের সারি! বম্বার!

চক্ষের নিমেষে এরোপ্লেনের সারি নিকটবর্তী হল–কিন্তু ট্রেনখানাকে গ্রাহ্য না করেই যেন এরোপ্লেনগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে যাচ্ছিল–হঠাৎ একখানা বম্বার দল ছেড়ে বেশ নীচু হয়ে এল। ট্রেনের সকলের মুখ শুকিয়েছিল আগেই–এখনযেন বুকের রক্ত পর্যন্ত জমে গেল। এই ফাঁকা মাঠে বোমা ফেললে ট্রেনের চিহ্ন খুঁজে মিলবে না। তার ওপরে ছাদ-খোলা ট্রাক গাড়ি বোঝাই সৈন্য, কারো মৃতদেহ এরপর সনাক্ত পর্যন্ত করা যাবে না। এ্যালিস ও মিনিকে বাঁচানো গেল না শেষে।

এরোপ্লেনখানা নীচে নেমে ছোঁ-মারা চিলের মতো একটি বোমা ফেলেই তখনি ওপরে উঠে গেল। সঙ্গেসঙ্গে ভীষণ বিস্ফোরণের শব্দ! সমস্ত ট্রেনখানা কেঁপে নড়ে উঠল যেন, কিন্তু ট্রেনের বেগ কমল না। বিমল চেয়ে দেখলে রেললাইন থেকে দশ গজ দূরে একটি জায়গায় বিশাল গর্তের সৃষ্টি করে মাটি, ধুলো, ঘাস, বালি অন্তত পঁচিশ ত্রিশ হাত উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে কালো ধোঁয়ার আবরণের মধ্যে বোমাটি সমাধি লাভ করেছে। বোমারু তাগ ঠিক করতে পারেনি।

আর মাইল পাঁচ-ছয় পরে একটি রেলস্টেশন। গাড়িখানা সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার পূর্বেই দেখা গেল স্টেশন থেকে প্রচুর ধোঁয়া বেরোচ্ছে–লোকজন ছোটাছুটি করছে–একটা হট্টগোল, কলরব, ব্যস্ততার ভাব। ট্রেনখানা স্টেশনে গিয়ে দাঁড়াতেই বোঝা

গেল জাপানি বিমান থেকে বোমা ফেলে স্টেশনটিকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। টিনের ছাদ দুমড়ে বেঁকে ছিটকে বহু দূরে গিয়ে পড়েছে, একপাশে আগুন লেগে গিয়েছে–গোটা প্ল্যাটফর্মে মানুষের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ, কারো হাত, কারো পা, কারো মুন্ড।

নিকটে একখানা গ্রাম। গ্রামের চিহ্ন রাখেনি বোমারুর দল। ইনসেনডিয়ারি বোমা ফেলে সারাগ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে।

ট্রেন থেকে সবাই নেমে সাহায্য করতে ছুটল। গ্রামের লোক বেশি মরেনি–তবুও বিমল দেখলে গ্রামের পথে চার-পাঁচটা বীভৎস মৃতদেহ পড়ে আছে। এরোপ্লেনগুলির চিহ্ন নেই আকাশে, তাদের কাজ শেষ করে তারা চলে গিয়েছে। গ্রামের নর-নারী ভয়ে বিহ্বল হয়ে মাঠের মধ্যে ছুটে পালিয়েছিল, যদিও বিপদের সম্ভাবনা ছিল সেখানেই সর্বাপেক্ষা বেশি, একটি মেয়ে একা ভাঙা ঘরের সামনে ভাঙাচোরা হাঁড়িকুড়ি বেতের পেটরা কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করছে আর কাঁদছে। একজন মেয়ে-সৈন্য তার কাছে গিয়ে চীনা ভাষায় কী জিজ্ঞেস করলে। বিমলের দল গ্রামের অন্য অন্য লোকজনের সাহায্য করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

একটু পরেই সেখানে ভারি একটি অদ্ভুত দৃশ্য সবারই চোখে পড়ল।

গ্রামের পাশে একটা ছোট্ট মাঠ–তারই এক গাছতলায় জনৈক বৃদ্ধ গ্রামের লোকজনকে চারিপাশে নিয়ে কী বলছেন বক্তৃতার ধরনে। বিমল চিনলে–প্রোফেসর লি!

এ্যালিস সকলের আগে এগিয়ে গিয়ে বললে–ড্যাডি! চিনতে পার?

সৌম্য মূর্তি শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ বক্তৃতা থামিয়ে একগাল হেসে ওর দিকে অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন–তোমরা কোথা থেকে?

এ্যালিস হেসে বললে–এই ট্রেন থেকে নামলাম। আর একটু হলে আমাদের কাউকে দেখতে পেতে না–আমাদের ট্রেনেও বোমা পড়েছিল।

বিমল বললে–গুডমর্নিং, প্রোফেসর লি। আপনার দলবল কোথায়? আপনি কী করছেন এখানে?

বৃদ্ধ বললে–দলবল এখান থেকে তিন মাইল দূরে আর একখানা বোমায় বিধ্বস্ত গ্রামে সাহায্য করছে। আমি এদের উপদেশ দিচ্ছি এরোপ্লেন বোমা ফেলতে এলে কী করে

আত্মরক্ষা করতে হয়। এরা কিছুই জানে না–দাঁড়িয়ে মরছে, নইলে দেখো গ্রামের অধিকাংশ লোক ফাঁকা মাঠে ছুটে পালায়?

–আপনাকে তো সর্বত্র দেখি, প্রোফেসর লি। পরের সাহায্য করতে এমনআর ক-জন লোক চীনদেশে আছেন জানি না। আপনাকে দেখে আপনার দেশের ওপর ভক্তি আমার অনেক বেড়ে গেল।

প্রোফেসর লি হেসে বললেন–আমার দেশ অতি হতভাগ্য, আমরা অতি প্রাচীন সভ্য জাতি কিন্তু জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছি। ভগবান নদীর এক কূল ভাঙেন আর এক কূল গড়েন। জাপান আজ উঠছে–আবার আমাদের দিন আসবে। আমার দিন ফুরিয়ে আসছে, যে ক-দিন বাঁচি, মূঢ়তা ও বর্বরতার দ্বারা অত্যাচারিত দেশের সেবা করে দিন কাটিয়ে যেতে চাই কিন্তু আমার দ্বারা আর কতটুকু উপকারই বা হবে?

বিমল বললে–বড়ো ইচ্ছে ভারতবর্ষের প্রথা অনুসারে আপনার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। আপনি কি অনুমতি করবেন? বৃদ্ধ মহাচীন যেন তাঁর সন্তানদের রক্ষা করেন আপনার মূর্তিতে।

বিমলের দেখাদেখি মিনি, এ্যালিস এবং আরও কয়েকটি মেয়ে-সৈনিক বৃদ্ধের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে হাসিমুখে।

ট্রেন হুইসল দিলে। কমাণ্ডান্টের হুকুম শোনা গেল–ট্রেনে গিয়ে উঠে পড়ো।

এ্যালিস বললে–ড্যাডি, তোমার সঙ্গে কোথায় আবার দেখা হবে? আমরা দু-টি মেয়ে এবং আমার এই ভারতবর্ষীয় বন্ধুটি তোমার সঙ্গে থেকে কাজ করতে চাই–অনুমতি দেবে ড্যাডি?

বৃদ্ধ বললেন–এখন তোমরা যাও খুকিরা–শিগগির আমার সঙ্গে দেখা হবে। এ কাজ তোমাদের নয়।

ট্রেন আবার চলল।

দু-ধারে শস্যক্ষেত্র, মাঝে মাঝে ধোঁয়ায় কালো অগ্নিদগ্ধ গ্রাম। জাপানি বোমারু বিমানের নিষ্ঠুরতার চিহ্ন।

এ্যালিস বললে–বিমল, আমার কী মনে হচ্ছে জান? প্রোফেসর লি-কে আবার আমাদের মধ্যে পেতে। এত ভালো লেগেছে ওঁকে! আমার নিজের বাবা নেই, ওকে দেখে সেই বাবার কথা মনে আসে।

বিমল দেখলে এ্যালিসের বড়ো বড়ো চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে।

মিনি বললে–আমারও বড়ো ভক্তি হয় সত্যি! ভারি চমৎকার লোক।

বিমল বললে–অথচ কীভাবে ওঁর সঙ্গে আলাপ তা জান? আমি যখন প্রথম চীনদেশে আসি–আজ প্রায় একবছর আগের কথা–তখন হ্যাং-চাউ রেলস্টেশনে উনি ওঁর ছাত্রদল নিয়ে উঠলেন–বললেন, যুদ্ধের সময় ওখানকার মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে যাচ্ছেন। শুনে আমার হাসি পেয়েছিল।

এ্যালিস বললে–তখন কী জানতে উনি একজন মহাপুরুষ লোক! উনি যুদ্ধ-উপদ্রুত অঞ্চলের মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে এসেছিলেন এটা ঠিকই কিন্তু পরের দুঃখ দেখে সেসব ওঁর ভেসে গেল। People such as these are the salts of the Earth-নয় কী?

বিমল মৃদু হেসে চুপ করে রইল।

একটি নদীর পুল বোমায় ভেঙে গিয়েছে। আর ট্রেন যাবার উপায় নেই। রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মচারীরা দিনরাত খাটছে যদি পুলটা কোনো রকমে মেরামত করে কাজ চালানো যায়।

কাছেই একটা তাঁবু। মাঠের মধ্যে কিছুদূরে জাপানিদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে। এটা ফিল্ড হাসপাতাল।

ট্রেন থেকে মেয়ে-সৈন্যদের পথেই নামিয়ে দেওয়া হল। ট্রেনখানা যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফিরে যাবে বলে পিছু হঠে চলে গেল। কোনো বড়ো স্টেশনে গিয়ে এঞ্জিনখানা সোজা করে জুড়ে নেবে। সম্পূর্ণ নতুন জায়গা। যেন অনেকটা পূর্ববঙ্গের বড়ো বড়ো জলা অঞ্চলের মতো। ফসলের খেত নেই–সামনে একটি বিল কিংবা ওই ধরনের জলাশয়–দীর্ঘ দীর্ঘ জলজ ঘাসের বন জলের ধারে। দূরে দূরে মেঘের মতো নীল পাহাড়। জায়গাটার নাম সিং চাং। বিমল নেমে চারিদিক দেখে অবাক হয়ে গেল।

ট্রেনে করে এতদূরে এসে এখানে আবার যুদ্ধক্ষেত্র কী করে এল।

বিমলের ধারণা ছিল জাপানিদের আসল ঘাঁটি কোনকালে পার হয়ে আসা গিয়েছে।

কিন্তু কমাণ্ডান্ট তাকে বুঝিয়ে বললেন–এখান থেকে আরও প্রায় পঁচিশ মাইল দূর হ্যাং কাউ শহর পর্যন্ত ওদের সৈন্যরেখা বিস্তৃত। সমুদ্রের উপকূলভাগে অনেক দূর অবধি ওরা নিজেদের লাইন ছড়িয়ে রেখেছে। মাটিতে একটা নকশা এঁকে বুঝিয়েও দিলেন।

বিমল একটি অনুচ্চ ঢিবির ওপর উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখলে।

কিছুদূরে একটি গ্রাম–পাশে কাদের অনেকগুলি ছোটো বড়ো তাঁবু–সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে, বোধ হয় রান্নাবান্না চলেছে। পশ্চিম দিকে একটি বড়ো শস্যক্ষেত্র, তার ধারে লম্বা লম্বা কী গাছের সারি। মোটের ওপর সবটা নিয়ে বেশ শান্তিপূর্ণ পল্লিদৃশ্য।

এ কী ধরনের যুদ্ধক্ষেত্র?

কিন্তু বিমলদের সেখানে উপস্থিত হবার আধ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ-ছ-জন আহত সৈন্যকে স্ট্রেচারে করে হাসপাতাল তাঁবুতে আনা হল। সকলেই রাইফেলের গুলিতে আহত।

বিমল জিজ্ঞেস করে জানল যুদ্ধক্ষেত্র যে বেশিদূর তাও নয়–ওই গাছের সারির পাশেই, এখান থেকে আধমাইলের মধ্যে। একটি ক্ষুদ্র গ্রাম জাপানিরা দখল করে সেখানে ঘাঁটি করেছে–চীনা সৈন্য ওদের সেখান থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছে।

কমাণ্ডান্টের আদেশে মেয়ে-সৈনিকরা রান্নাবান্না করে খাবার আয়োজন করতে লাগল– কারণ অনেকক্ষণ তারা বিশেষ কিছু খায়নি। বিমল বললে–খাইয়ে নিয়ে এদের কী এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হবে? কমাণ্ডান্ট বললে–না, এরা পরিশ্রান্ত। ক্লান্ত সৈন্যদের দিয়ে যুদ্ধ হয় না–ওদের অন্তত দশঘণ্টা বিশ্রাম করতে দেব।

তারপর?

তারপর যুদ্ধে পাঠাতে পারি–রিজার্ভ রাখতে পারি। এখান থেকে সাত মাইল দূরে হ্যাং কাউ-ক্যান্টন রেলের ধারে একটি গ্রামে নাইনথ রুট আর্মির এক ঘাঁটি। সেখানে জেনারেল মাও-সি-তুং আছেন–তাঁর হুকুমমতো কাজ হবে।

হুকুম আসবে কী করে?

ঘোড়ার পিঠে যায় আসে ডেসপ্যাঁচ দল। আমাদের ফিল্ড টেলিফোন নেই।

কমাণ্ডান্টের সঙ্গে কথা বলে ফিরে গিয়ে বিমল হাসপাতাল তাঁবুতে আহত সৈন্যদের চিকিৎসার কাজে মন দিল। তিনটি হতভাগ্য সৈনিক কোননাপ্রকার সাহায্য পাবার পূর্বেই মারা গেল। বাকি কয়েকজনের করুণ আর্তনাদে হাসপাতাল মুখরিত হয়ে উঠল। কী নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক ব্যাপার এই যুদ্ধ! একথা বিমলের মনে না এসে পারল না।

এ্যালিস এসে বললে–এদের জন্যে বৃথা চেষ্টা। এদের একজনও বাঁচবে না।

বিমল বললে–তাই মনে হয়। না আছে ওষুধ, না আছে যন্ত্রপাতি, কী দিয়ে চিকিৎসা করব?

বিমল, এদের জন্যে আমেরিকান রেডক্রসে লিখে কিছু জিনিস আনার চেষ্টা করব?

লেখো না। নইলে সত্যি বলছি আমাদের খাটুনি বৃথা হবে।

ঠিকই তো? এটা কি একটা হাসপাতাল? কী ছাই আছে এখানে?

মিনি কোথায় গেল?

সে রাঁধছে। খেতে হবে তো? রাঁধবার কোনো বন্দোবস্ত নেই। দু-টি চাল ছাড়া আর কিছুই দেয়নি।

টিনবন্দি খাবার কিছু সাংহাই থেকে আনিয়ে নিই। ও খেয়ে তোমরা বাঁচবে না।

একটা কথা শোনো। তুমি একবার সাংহাই যাও–মিনি সুরেশ্বর সম্বন্ধে বড়ো উদবিগ্ন হয়েছে আমায় বলছিল। ও আমায় কাল থেকে বলছে তোমায় বলতে।

আমিও যে তা না ভেবেছি এমন নয়। কিন্তু সাংহাই পর্যন্ত কোনো ট্রেন এখান থেকে যাচ্ছে তো? আচ্ছা, কমাণ্ডান্টকে বলে দেখি।

আবার চারজন আহত সৈনিককে স্ট্রেচারে করে আনা হল। একজনের মাথার খুলির অর্ধেকটা উড়ে গিয়েছে বললেই হয়। বিমল বললে–এ তো গেল! একে এখানে কেন এনেছে?

কিন্তু অদ্ভুত জীবনীশক্তি চীনা সৈনিকটির। মাথার ব্যাণ্ডেজ রক্তে ভেসে যাচ্ছে, দু-বার ব্যাণ্ডেজ বদলাতে হল, তবুও সৈনিকটি মারা গেল না–বিমল ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখলে।

একজন সৈনিক ডেসপ্যাঁচ-রাইডার হাসপাতাসে ঢুকে বললে–আমাদের তাঁবু ওঠাতে হবে এখান থেকে–শত্রু খুব নিকটে এসে পড়েছে। রেললাইনের ওপর ওদের লক্ষ কিনা? রেললাইনটি দখল করবে। আমাদের সৈন্য প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে কিন্তু আজ সারাদিনে জাপানিরা প্রায় একমাইল এগিয়েছে। দেখবে এসো।

তারপরে সৈনিকটি একটা ফিল্ড গ্লাস বার করে বিমলের হাতে দিয়ে বললে–পূর্বদিকে ওই যে গাঁ-খানা দেখা যাচ্ছে ওদিকে চেয়ে দেখো–বিমল একখানা গ্রাম বেশ স্পষ্ট দেখছিল, কিন্তু তার অতিরিক্ত কিছু না। সৈনিকটি বললে–ওই গ্রামখানির পেছনেই শত্রুর লাইন। গ্রামখানা দখল করতে ওরা আজ ক-দিন চেষ্টা করছে–ওখানেই আমরা বাধা দিচ্ছিলাম। আজ গ্রামের অর্ধেকটা দখল করেছে। সুতরাং, বোধহয় কাল কী পরশু রেললাইনে এসে পৌঁছোবে।

গ্রামে লোকজন আছে?

পাগল! কবে পালিয়েছে। পশ্চিম দিকে একটা নদী আছে–তার ওপারে পলাতক গৃহহারাদের একটা বস্তি বসে গেছে। আট-দশখানা গ্রামের লোক জড়ো হয়েছে ওখানে।

খাবার দিচ্ছে কে?

কে দেবে? অনাহারে অনেকে দিন কাটাচ্ছে। তাদের দুর্দশা দেখলে বুঝবে বর্তমান কালের যুদ্ধ কী নিষ্ঠুর ব্যাপার।

বিমল কথায় কথায় জানতে পারলে, ডেসপ্যাঁচ রাইডার সৈনিকটি শিক্ষিত ভদ্রসন্তান পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট–পূর্বে স্কুল মাস্টারি করত, যুদ্ধ বাধবার পর সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে।

বিমল বললে–তুমি আমাকে ওই গ্রামে নিয়ে চলো না।

এমনিই তো যেতে হবে। বোধ হয় ওখানেই হাসপাতাল উঠে যাবে–কারণ শত্রুর লাইন থেকে জায়গাটা দূরে।

এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলতে বারণ করেছে কে? কেউ না। সে তো সর্বত্রই ফেলছে। তবে একটি পাইনবনের তলায় এ বস্তি–জাপানি প্লেন হঠাৎ সন্ধান পাবে না। ভয়ে ওরা রান্না করে না।–পাছে ধোঁয়া দেখে বোমারু প্লেন সন্ধান পায়।

সৈনিকটি চলে গেলে বিমল এ্যালিসকে ডেকে কথাটি বলতে যাচ্ছে, এমন সময় একখানা ট্রেনের শব্দ শোনা গেল দূরে।

এ্যালিস তাড়াতাড়ি তাঁবুর বাইরে এসে বললে–ট্রেন আসছে, না এরোপ্লেন? বিমল বললে–ট্রেনই। বোধ হয় আরও সৈন্য আসছে। চলো দেখি গিয়ে। অনেকে রেললাইনের ধারে জড়ো হল। এখানে স্টেশন নেই। একজন লোক নিশান হাতে

অপেক্ষা করছিল–নিশান দেখিয়ে ট্রেন দাঁড় করাবে। ট্রেন এসে পড়ল। সারি সারি খোলা মালগাড়িতে সৈন্য বোঝাই– অন্য সাধারণ যাত্রীও আছে। কতকগুলি ছাদ-আঁটা মাল-গাড়ি পেছনের দিকে–তাতে সৈন্যদের রসদ বোঝাই।

গাড়ি থেকে দলে দলে সৈন্য নামতে লাগল। জাপানি সৈন্যদের হাত থেকে গ্রাম রক্ষা করবার জন্যে এরা আসছে ক্যান্টন থেকে। রসদ বোঝাই মালগাড়িগুলি থেকে রসদ নামানোর ব্যবস্থা করা হতে লাগল–কারণ বেশিক্ষণ ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকলে এখুনি কোনদিক থেকে জাপানি বিমান আকাশপথে দেখা দেবে হয়তো। হঠাৎ এ্যালিস উত্তেজিত সুরে বললে–বিমল, বিমল–ও কে? প্রোফেসর লি না?

তারপরেই সে হাসিমুখে সামনের দিকে ভিড়ের মধ্যে ছুটে গেল—ড্যাডি–ড্যাডি—

সত্যিই তো–হ্যাঁস্যমুখ বৃদ্ধ একটি বড়ো ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে ভিড় ঠেলে বাইরে আসতে চেষ্টা করছেন।

বিমল এগিয়ে গিয়ে বললে–নমস্কার প্রোফেসর লি–ব্যাগটা আমার হাতে দিন। আপনি কোথা থেকে?

এ্যালিস ততক্ষণ গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধ তার কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে বিমলের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললেন–তোমরা এখানে আছ? বেশ বেশ। আমি এসেছি পলাতক গ্রামবাসীদের যে বস্তি আছে নদীর ওপারে–সেখানে কয়েক পিপে আপেল বিলি করতে। আমেরিকান জুনিয়র রেডক্রস দু-শো পিপে ভালো ক্যালিফোর্নিয়ার আপেল পাঠিয়েছে দুঃস্থ বালক-বালিকাদের খাওয়ানোর জন্যে। আমার ঠিকানাতেই পাঠিয়েছিল। আর সব বিলি করে দিয়েছি অন্য অন্য স্থানে–দশ পিপে মজুত আছে এখনও। তা তোমরা আছ ভালোই হয়েছে–তোমরা সাহায্য করো এখন।

এ্যালিস তো বেজায় খুশি। বললে–ড্যাডি, খুব ভালো কথা। তা বাদে আরও অনেক কাজ হবে যখন তুমি এসে পড়েছ। চলো, আপেলের পিপে সব নামিয়ে নিই।

এমন সময় মিনি ভিড়ের মধ্যে কোথা থেকে ছুটে এসে ব্যস্তভাবে বললে–শিগগির এসো বিমল, শিগগির এসো এ্যালিস–সুরেশ্বর নামছে ওই দেখো ট্রেন থেকে

সুরেশ্বর সত্যিই নামছে বটে–তার সঙ্গে দু-জন চীনা ডাক্তার, এদেরও বিমল চেনে–সাংহাই চীনা রেডক্রস হাসপাতালে এরা ছিল।

বিমল বললে–প্রোফেসর লি–একটু আমায় ক্ষমা করুন, পাঁচমিনিটের জন্যে আসছি।

সুরেশ্বর তো ওদের দেখে অবাক। বললে– তোমরা এখানে! মিনি আর এ্যালিসই বা এখানে কী করে এল! সাংহাইতে বেজায় গুজব এদের চীনা গুন্ডারা গুম করেছে–আর বিমল তুমি জাপানিদের হাতে বন্দি। মিনি কেমন আছে?

বিমল বললে–সেসব কথা হবে এখন। চলো এখন সবাই মিলে তাঁবুতে গিয়ে বসা যাক। অনেক কথা আছে। প্রোফেসর লি-কে ডেকে আনি–উনিও আমাদের সঙ্গে আসুন। তোমরা এগিয়ে চলো ততক্ষণ। আমি ওঁর আপেলের পিপেগুলি নামাবার কী ব্যবস্থা হল দেখে আসি।

কিছুক্ষণ পরে দুঃস্থ চীনা নর-নারীদের তাঁবুতে সুরেশ্বর, বিমল, এ্যালিস ও মিনি আপেল বিলির কাজে প্রফেসর লিকে সাহায্য করছিল। এ জায়গা ঠিক তাঁবু নয়, একটি পাইন বন, তার মাঝে মাঝে পুরোনো ক্যাম্বিস, চট, মাদুর, ভাঙা টিন প্রভৃতি জোড়াতালি দিয়ে আশ্রয় বানিয়ে তারই মধ্যে হতভাগ্য গৃহহারার দল মাথা গুঁজে আছে। ওদের দুর্দশা দেখে বিমলের কঠিন মনেও দুঃখ ও সহানুভূতির উদ্রেক হল। ছোটো ছোটো উলঙ্গ, ক্ষুধার্ত, কাদামাটি মাখা শিশুদের ব্যগ্র প্রসারিত হাতে আপেল বিলি করবার সময় এ্যালিসের চোখ দিয়ে জল পড়তে দেখলে বিমল। নাঃ–বড়ো ছেলেমানুষ এই এ্যালিস! ... এ্যালিসের প্রতি একটা কেমন অকারণ স্নেহে ও মমতায় বিমলের মন গলে যায়। কী সুন্দর মেয়ে এ্যালিস আর কী ছেলেমানুষ!

হঠাৎ একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল। আপেল বিলি করতে করতে প্রফেসর লি এক সময় একটা আপেলের পিপের মধ্যে ঘাড় নীচু করে দেখে বললেন–চারটে আপেল আর বাকি আছে। আমি ক্যালিফোর্নিয়ার আপেল কখনো খাইনি–একটি আমি খাব।

বলেই সদানন্দ বৃদ্ধ বালকের মতো আনন্দে একটি আপেল তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করে দিলেন। বিমল অবাক, সে যেন একটি স্বর্গীয় দৃশ্য দেখলে। শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে তার মাথা লুটিয়ে পড়তে চাইল বৃদ্ধের পায়ে। সঙ্গে সঙ্গে একটি অদ্‌ভুত ধরনের ভালোবাসা এসে তার মনে উপস্থিত হল, বৃদ্ধের প্রতি। এঁকে ছেড়ে আর সে থাকতে পারবে না–অসম্ভব! যেমন সে আর এ্যালিসকে ছেড়ে কখনো থাকতে পারবে না। চীনদেশে তার আসা সার্থক হয়েছে এই দু-জনের সাক্ষাৎ পেয়ে। এই যুদ্ধের বর্বরতা, হত্যা, বোমাবর্ষণ, রক্তপাত, অনাহার, দারিদ্র্য, এই চারিদিকের বীভৎস নরবলির হৃদয়হীন অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রফেসর লি আর এ্যালিস (অবশ্য মিনিও আছে)–এদের আবির্ভাব দেবতার আবির্ভাবের মতোই অপ্রত্যাশিত ও সুন্দর।

এ্যালিস ও মিনি ছুটে গেল ছেলেমানুষের মতো।

www.bengaliebook.com

–ড্যাডি, ড্যাডি, আমাদের একটা আপেল দেবে না? ...

বৃদ্ধ হাসিমুখে বললেন–মেয়েদের না দিয়ে কী বুড়োবাবা খায়? দু-টি রেখে দিয়েছি তোমাদের দুজনের জন্যে–আর একটি বাকি আছে, কে নেবে?

বিমল বললে–সুরেশ্বর নাও।

সুরেশ্বর বললে–বিমল, তুমি নাও, আমি আপেল খাই না।

এ্যালিস বললে–খাও, সুরেশ্বর, আমি আমার আধখানা বিমলকে দিচ্ছি।

মিনি বললে–তা নয়, বিমল খাও, আমি আধখানা সুরেশ্বরকে দেব।

প্রোফেসর লি মীমাংসা করে দিলেন–একটি আপেল ভাগাভাগি করে খাবে বিমল ও সুরেশ্বর। মেয়েরা আস্ত আপেল খাবে। তাঁর কথার ওপর আর কেউ কথা বলতে সাহস করলে না।

সেই সৈনিক ডেসপ্যাঁচ-রাইডারটি এসে খবর দিলে, হাসপাতাল তাঁবু এখানেই উঠে আসছে–পাইনবনের মাঝখানে। সামনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কম্যাণ্ডান্ট খবর পাঠিয়েছেন। ডেসপ্যাঁচ-রাইডার আরও এক করুণ সংবাদ দিলে–আজ সকালে জাপানিদের হ্যাঁণ্ডগ্রেনেড চার্জে নারীবাহিনীর সতেরোটি তরুণী একদম মারা পড়েছে। একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে তাদের দেহ–হাত, পা, মুন্ড, আঙুল–ছড়িয়ে ছত্রাকার হয়ে গিয়েছে।

মিনি শিউরে উঠে বললেও হাউ সিম্পলি ড্রেডফুল!

কেন জানি না এই দুঃসংবাদে বিমলের মন এ্যালিসের প্রতি মমতায় ভরে উঠল। এ্যালিসের মতই উদার, নিস্বার্থ সতেরোটি তরুণী–কত গৃহ অন্ধকার করে, কত বাপ-মায়ের হৃদয় শূন্য করে চলে গেল!–মানুষ মানুষের ওপর কেন এমন নিষ্ঠুর হয়?

হঠাৎ পলাতকদের মধ্যে একটা ভয়ার্ত শোরগোল উঠল। সবাই ছুটছে, গাছের তলায় গুঁড়ি মেরে বসেছে, ঘাসের মধ্যে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ছে–একটা হুড়োহুড়ি, এ ওকে ঠেলছে, দু-একজন ঊর্ধ্বশ্বাসে খোলা মাঠের দিকে ছুটছে।

ডেসপ্যাঁচ রাইডার সৈনিক যুবকটি ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে–নীচু হয়ে বসে পড়ন–সবাই শুয়ে পড়ুন,–জাপানি বম্বার!

আকাশে এরোপ্লেনের আওয়াজ বেশই স্পষ্ট হয়ে উঠল…বিমল চোখ তুলে দেখলে পাইনবনের মাথার ওপর আকাশে দু-খানা কাওয়াসাকি বম্বার…নিজের অজ্ঞাতসারে সে তখুনি এ্যালিসের হাত ধরে তাকে একটি গাছের তলায় নিয়ে দাঁড় করালে।

প্রোফেসর লি–প্রোফেসর লি–এদিকে আসুন–

ভীষণ একটা আওয়াজ … বিদ্যুতের মতো আলোর চমক … ধোঁয়া, মাটি … পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠল ভূমিকম্পের মতো … সবারই কানে তালা … চোখে অন্ধকার … জাপানি বম্বার বোমা ফেলছে।

সঙ্গেসঙ্গে চারিদিকে আর্তনাদ কান্না … গোঁঙানি … নারীকন্ঠের ভয়ার্ত চিৎকার।

আবার একটি … বিমলের মনে হল পৃথিবীর প্রলয় সমাগত। পৃথিবী দুলছে, আকাশ দুলছে … কেউ বাঁচবে না, মিনি, এ্যালিস, সে, সুরেশ্বর, প্রোফেসর লি, সবাই এই প্রলয়ের অনলে ধ্বংস হবে।

তারপর কটা বোমা পড়ল এরোপ্লেন থেকে–তা আর শূনে নেওয়া সম্ভব হল না বিমলের পক্ষে। বিস্ফোরণের আওয়াজ ও মনুষ্য-কণ্ঠের আর্তনাদের একটি একটানা শব্দপ্রবাহ তার মস্তিষ্কের মধ্যে বয়ে চলেছে–একটি থেকে আর একটিকে পৃথক করে নেওয়া শক্ত।

তারপর হঠাৎ যখন সব থেমে গেল, এরোপ্লেন চলে গিয়েছে–যখন বিমল আবার সহজ বুদ্ধি ফিরে পেল–তখন দেখলে এ্যালিসের একখানা হাত শক্ত করে তার নিজের মুঠোর মধ্যে ধরা–মিনি, সুরেশ্বর, প্রোফেসর লি সকলে মাটিতে শুয়ে–হয়তো সবাই মারা গিয়েছে সে-ই একমাত্র রয়েছে বেঁচে।

প্রথমে মাটি থেকে ঝেড়ে উঠল এ্যালিস। তারপর প্রোফেসর লি, তারপর সুরেশ্বর।– মিনি মূর্ছা গিয়েছে–অনেক কষ্টে তার চৈতন্য সম্পাদনা করা হল। হঠাৎ এ্যালিস চমকে উঠে আঙুল দিয়ে কী দেখিয়ে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

সেই তরুণ ডেসপ্যাঁচ-রাইডারের দেহ অস্বাভাবিকভাবে শায়িত কিছুদুরে। রক্তে আশপাশের মাটি ভেসে গিয়েছে–একখানা হাত উড়ে গিয়েছে–বীভৎস দৃশ্য। সেদিকে চাওয়া যায় না।

কিন্তু দেখা গেল পলাতক গৃহহীন ব্যক্তিদের খুব বেশি ক্ষতি হয়নি। কয়েকটি ছেলে-মেয়ে এবং একটি বৃদ্ধ জখম হয়েছে মাত্র। পাইনবনের পাতার আড়ালে ছিল এরা– ওপর থেকে বোমার লক্ষ্য ঠিকমতো হয়নি।

প্রোফেসর লি-র সঙ্গে এ্যালিস ও মিনি আহতদের সাহায্যে অগ্রসর হল।

সন্ধ্যার পরে একখানা ট্রেন এসে দাঁড়াল। নাইনথ রুট আর্মির একটি ব্যাটালিয়ন ট্রেন থেকে নামল–এরা এসেছে রেলপথ রক্ষা করতে এবং দু-টি সাঁকো পাহারা দিতে।

বিমল সুরেশ্বরকে বললে–আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে বলতে গেলে একরকম বাস করছি, অথচ লড়াই যে কোনদিকে হচ্ছে–কীভাবে হচ্ছে–তা কিছুই জানিনে, চোখেও দেখতে পাচ্ছি নে।

রাত্রে কমাণ্ডান্টের সারকুলার বেরোলো– রেললাইনের প্রান্ত পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে–আজ শেষ রাত্রে জাপানিরা আক্রমণ করবে–সকলে তৈরি থাকো, যারা সৈন্য নয় যুদ্ধ করছে না–এমন শ্রেণির লোক দূরে চলে যাও।

রাত প্রায় বারোটা। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।

সুরেশ্বর বর্ষাতি কোট গায়ে বাইরে থেকে হাসপাতাল তাঁবুতে ঢুকে বললে–আমাদের আয়ু মনে হচ্ছে ফুরিয়ে এসেছে। সারকুলার দেখেছ?

বিমল বললে–গতিক সেইরকমই বটে। জাপানিরা হ্যাঁণ্ডগ্রেনেড চার্জ করলে কেউ বাঁচবে না।

আমি ভাবছি মেয়েদের কথা—

প্রেফেসর লি-কে কথাটা বলা ভালো। উনি কি বলেন দেখি।

প্রোফেসর লি-কে ডাকতে গিয়ে একটি সুন্দর দৃশ্য বিমলের চোখে পড়ল। হাসপাতাল তাঁবুর পাশে একটি ছোট্ট চটে-ছাওয়া তাঁবুতে এ্যালিস ও মিনি কী রান্না করছে আগুনের ওপর—বৃদ্ধ লি ওদের কাছে উনুন ঘেঁষে বসে বুড়ো ঠাকুরদাদার মতো গল্প করছেন। এ্যালিস বললে–তোমার বন্ধু কোথায় বিমল–খেতে হবে না তোমাদের আজ? ড্যাডি আমাদের এখানে খাবেন। উঃ–কী সত্যি কথা। গোলমালে তার মনেই নেই যে সন্ধ্যা থেকে কারো পেটে কিছু যায়নি! বিমল সুরেশ্বরকে ডেকে নিয়ে এল। খাবার বিশেষ কিছু নেই। শুধু ভাত ও শুকনো সিঙ্গাপুরি কাঁচকলা, চর্বিতে ভাজা।

একজন ডেসপ্যাঁচ-রাইডার ব্যস্তভাবে তাঁবুর বাইরে এসে বিমলকে ডাক দিলে। তার হাতে একখানা ছোট্ট শিল-করা খাম।

আপনি হাসপাতালের ডাক্তার?

আপনার চিঠি। ট্রেন এখুনি একখানা আসছে। টেলিগ্রামে অর্ডার দিয়ে আনানো হচ্ছে। আপনি আপনার নার্স ও রোগী নিয়ে হ্যাং-কাউতে এই ট্রেনে যাবেন আপনাকে একথা বলার আদেশ আছে আমার ওপর। গুড নাইট।

দাঁড়ান, দাঁড়ান। কেন হঠাৎ এ আদেশ জানেন?

আমরা এই রেলের জন্যে আর লোক ক্ষয় করব না। জেনারেল চু-টে-র আদেশ এসেছে হেডকোয়ার্টার্স থেকে। পরবর্তী যুদ্ধ হবে এর দশমাইল দূরে। আর এখুনি আপনারা তৈরি হোন। আজ শেষ রাত্রে জাপানিরা আড্ডা দখল করবে। তার আগে হয়তো গোলা ছুঁড়তে পারে।

প্রোফেসর লি কাছেই দাঁড়িয়ে সব শুনেছিলেন। তিনি বললেন–আমি এই ট্রেনে গরিব গ্রামবাসীদের উঠিয়ে নিয়ে যাব। নইলে জাপানি বোমা থেকে যাও-বা বেঁচেছে, গোলা আর হ্যাঁণ্ডগ্রেনেড খেলে তাও যাবে। আপনি দয়া করে আমার এই অনুরোধ কমাণ্ডান্টকে জানিয়ে আমায় খবর দিয়ে যাবেন?

ডেসপ্যাঁচ-রাইডার অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হল।

আরও দেড়ঘণ্টা পরে এল ট্রেন। প্রায় খালি। তবে পেছনের গাড়িগুলি পুঁটকি মাছ বোঝাই –বিষম দুর্গন্ধ। বিমল হাসপাতালের সব লোকজন নিয়ে ট্রেনে উঠল–মিনি, এ্যালিস, দুটি চীনা নার্স, সাত-আটটি রোগী। প্রোফেসর লি ইতিমধ্যে তাঁর দলবলনিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু ট্রেনের সামরিক গার্ড কমাণ্ডান্টের বিনা আদেশে তাঁর দলবল গাড়িতে ওঠাতে চাইলে না।

এ্যালিস বললে–বিমল, ওদের বলো তাহলে আমরাও যাব না। ওঁকে ফেলে আমরা যাব না। ট্রেনের সামরিক গার্ড বললে–আমার কোনো হাত নেই। আপনারা না যান, পনেরো মিনিট পরে আমি গাড়ি ছেড়ে দেব।

এ্যালিস ও মিনি নামল। চীনা নার্স দু-টিও এদের দেখাদেখি নাবল। ট্রেনের গার্ড বললে– রোগীরা কাদের চার্জে যাবে? একজন ডাক্তার চাই। আমি রিপোর্ট করলে আপনাদের কোর্ট মার্শাল হবে। আপনারা হাসপাতালের কর্মচারী, সামরিক আদেশ অনুসারে কাজ করতে বাধ্য।

বিমল বললে–সে এঁরা নন–এই মেয়ে দু-টি। এঁরা আমেরিকান রেডক্রস সোসাইটির। চীনা পার্লামেন্টের হাত নেই এদের ওপর।

এদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হচ্ছে, এমন সময়ে ডেসপ্যাঁচ-রাইডারটিকে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে দেখা গেল এবং কিছুক্ষণ পরে প্রোফেসর লি তাঁর দলবল নিয়ে হুড়মুড় করে ট্রেনে উঠে পড়লেন। ট্রেনও ছেড়ে দিল।

.

দিন পনেরো পরে।

হ্যাং-কাউ শহরের উপকণ্ঠে পবিত্র ফা-চীন মন্দির। মিং রাজবংশের রাজকুমারী ফা-চিন তাঁর প্রণয়ীর স্মৃতির মান রাখবার জন্যে চিরকুমারী ছিলেন—এবং একটি ক্ষুদ্র বৌদ্ধ মঠে দেহত্যাগ করেন একষট্টি বছর বয়সে। তাঁর দেহের পুণ্য ভস্মরাশির ওপরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের চারিধারে অতি মনোরম উদ্যান ও ফোয়ারা।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে এ্যালিস ও বিমল মার্বেলের চৌবাচ্চায় মন্দিরের অতি বিখ্যাত লাল মাছ দেখছিল। অনেক দূর থেকে লোকে এই লাল মাছ দেখতে আসে—আর আসে নব-বিবাহিত দম্পতি—তাদের বিবাহিত জীবনের কল্যাণ কামনায়।

একটি গাছের ছায়ায় বেঞ্চিতে এ্যালিস ক্লান্তভাবে বসল।

বিমল বললে—মিনিরা কোথায়?

মন্দিরের মধ্যে ঢুকেছে। এখানে বোসো। কেমন সুন্দর লাল মাছ খেলা করছে দেখো। আমি কী ভাবছি বিমল জান, এমন পবিত্র মন্দির, এমন সুন্দর শান্তি, এইপ্রাচীন পাইন গাছের সারি—সব জাপানি বোমায় একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। যুদ্ধের এই পরিণাম, প্রাচীন দিনের শান্তি ও সৌন্দর্যকে চুরমার করে বর্বরতাকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

এ্যালিস, আর কতদিন চীনে থাকবে?

যতদিন যুদ্ধ শেষ না হয়, যতদিন একজন আহত চীন সৈনিকও হাসপাতালে পড়ে থাকে। ততদিন ড্যাডি লি তাঁর সাহায্যকারিণী মেয়ের দরকার অনুভব করেন।

এ্যালিস বিমলের দিকে চেয়ে বললে—কিন্তু বিমল ততদিন তোমাকেও তো থাকতে হবে—তোমাকে যেতে দেব না।

পাইন গাছের ওদিকে নিকটেই প্রোফেসর লি-র প্রাণখোলা হাসি ও কথাবার্তার আওয়াজ শোনা গেল।

এ্যালিস বললে–ওরা এদিকেই আসছে।

এ্যালিসের ভুল হয়েছিল, মিনি আর সুরেশ্বর এল না–এলেন প্রোফেসর লি। এই বয়সেও তাঁর চোখের অমন অদ্ভুত দীপ্তি যদি না থাকত, তবে তাঁকে জনৈক বৃদ্ধ চীনা রিকশাওয়ালা বলে ভুল করা অসম্ভব হয় না–এমনি সাদাসিধে তাঁর পরিচ্ছদ।

প্রোফেসর লি বললেন–হ্যাং-কাউ শহরে এসে আমার গরিব গ্রামবাসীরা আশ্রয় পেয়ে বেঁচেছে। কিন্তু গভর্নমেন্টের তৈরি মাটির নীচের ঘরে লুকিয়ে থাকলে আমার চলবে না এ্যালিস, আমি কালই এখান থেকে গ্রামে চলে যাব।

এ্যালিস বললে, কেন?

দক্ষিণ চীনে সর্বত্র ভীষণ দুর্ভিক্ষ। লোক না খেয়ে মরছে, তার সাথে বোমা আছে। মড়ক লেগেছে। আমার এখানে বসে থাকলে চলে?

আমি আবেদন পাঠিয়েছি আমেরিকায় মার্কিন রেডক্রস সোসাইটির মধ্যস্থতায়। তারাই আপেল পাঠিয়েছিল এদের খাওয়াতে। যতদূর জানা গিয়েছে, ওরা কিছু অর্থ মঞ্জুর করেছে! টাকাটা শিগগির আসবে।

এ্যালিস বললে–ড্যাডি, আমার একটি প্রস্তাব শুনবেন? আমার মাসিমা নিঃসন্তান বিধবা, অনেক টাকার মালিক। আমায় তিনি উইল করে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলেন, টাকাটা আমি চাইলেই পাব। সেই টাকা আপনাকে দিচ্ছি–হ্যাং-কাউ শহরে দুঃস্থ বালক-বালিকাদের জন্যে একটি হোম খুলুন। আপনি লেখালেখি করলে গভর্নমেন্টও কিছু সাহায্য করবে। আমি আর মিনি ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনো করব।

প্রোফেসর লি বললেন–তোমার ধন্যবাদ, এ্যালিস। অতি দয়াবতী মেয়ে তুমি, কিন্তু তোমার টাকা নেব না। তা ছাড়া, এমন কোনো বড় আশ্রয়স্থল আমরা গড়তে পারব না, যাতে সকল দুঃস্থ বালক-বালিকাদের আমরা জায়গা দিতে পারি। সারা দক্ষিণ-চীন বিপন্ন, কত ছেলে-মেয়েকে আমরা পুষতে পারি? মাঝে পড়ে তোমার টাকাগুলি যাবে।

বিমল একটি জিনিস লক্ষ করেছে, এ্যালিসের ওপর প্রোফেসর লি-র স্নেহ নিজের সন্তানের ওপর পিতার স্নেহের মতোই। উনি চান না এ্যালিসের টাকাগুলি খরচ করিয়ে দিতে। নইলে উনি হোম গঠনের বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেখালেন, সেটি এমন কিছু জোরালো নয়। সব দুঃস্থ লোকদের আশ্রয় দিতে পারছি নে বলে তাদের মধ্যে কাউকেও আশ্রয় দেব না?

এমন সময় সুরেশ্বর ও মিনি এসে বললে–এসো এ্যালিস, এসো বিমল, একটি জিনিস দেখে যাও।

ওরা বাগানের বেঞ্চি থেকে উঠে মন্দিরের উঁচু চত্বরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে দেখলে ওদের আগে আগে দু-টি চীনা তরুণ-তরুণী মন্দিরে উঠছে। তাদের হাতে ছোটো ছোটো ধ্বজা, মোমবাতি ও ফুল।

মিনি বললে–ওদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ছেলেটি বেশ ইংরেজি জানে। ওর ডাক পড়েছে যুদ্ধে, যুদ্ধে যাওয়ার আগে ওই মেয়েটিকে কাল বিয়ে করেছে; অনেকদিন থেকে মেয়েটি ওর বাগদত্তা। ফা-চীন মন্দিরে আশীর্বাদ নিতে এসেছে–

বিমল ও এ্যালিস নিজেদের অজ্ঞাতসারে শিউরে উঠল। বর্তমান যুগের ভীষণ মারণাস্ত্রের সামনে যুদ্ধ। আয়ু ফুরিয়ে যেতে পারে যেকোনো মুহূর্তে। একটি বোমার অপেক্ষা মাত্র। তরুণীর বয়স অল্প–ষোলো-সতেরো।

চীন দেশে সম্ভ্রান্ত-সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নেই।

তরুণ-তরুণীর মুখ প্রফুল্ল ও হাস্যময়। কোনোদিকে ওদের লক্ষ নেই। মন্দিরের অন্ধকার গর্ভগৃহে মোমবাতি জ্বলছে। ওরা খোদাই-করা কাঠের চৌকাঠ পার হয়ে রাজকুমারী ফা-চীন এর কৃত্রিম সমাধির সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলে, ফুল ছড়িয়ে দিলে, দু-জনে পাশাপাশি বসে রইল খানিকক্ষণ চুপ করে। তারপর ওরা উঠল–ঘর থেকে বাইরে এসে মন্দিরের চত্বরে দাঁড়াল। দু-জনে দু-জনের হাত ধরে আছে–দু-জনের হাসি-হাসি মুখ।

এ্যালিস বললে–মিনি, ওঁদের এখানে দাঁড়াতে বলো না। আমাদের অনুরোধ—

মিনি বললে–আপনারা একটু দয়া করে যদি দাঁড়ান–মন্দিরের চত্বরে—

যুবক ওদের দিকে হাসিমুখে চাইল, তারপর মেয়েটিকে চীনাভাষায় কী বললে। তরুণীও অল্প হাসিমুখে ওদের দিকে একবার চেয়ে দেখে চোখ নীচু করলে।

যুবক হাসিমুখে বললে–ফোটো নেবে বুঝি? আলো নেই মোটে–ফোটো উঠবে?

এ্যালিস এই সময় মন্দিরের বাইরের ফুলের দোকান থেকে একরাশ ফুল কিনে নিয়ে এল। বৃদ্ধ লিকেও সে ডেকে এনেছে বাগান থেকে। হাসিমুখে বললে–ড্যাডি, এইফুল নিয়ে ওদের আশীর্বাদ করুন– তোমরাও সবাই ফুল নাও।

যুবকের সঙ্গে প্রোফেসর লি চীনা ভাষায় কী কথাবার্তা বললেন, তারপর সকলে অর্ধচক্রাকারে ঘিরে দাঁড়াল নবদম্পতিকে।

প্রোফেসর লি চিনা ভাষায় গম্ভীর স্বরে কয়েকটি কথা উচ্চারণ করে ওদের ওপরফুল ছড়িয়ে দিলেন–তারপর সকলে ফুল ছড়ালে ওদের ওপর। এ্যালিস ও মিনির কী হাসি ফুল ছড়াতে ছড়াতে।

তরুণ-তরুণী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিমল একবার চারিদিকে চেয়ে দেখল–সন্ধ্যা নেমেছে। কোথাও আর রোদ নেই–এই পবিত্র, প্রাচীন ফা-চীন মন্দির, পাইন বন, লাল মাছের চৌবাচ্চা, শান্ত গভীর সন্ধ্যা–এই কলহাস্যমুখরা বিদেশিনি মেয়ে দু-টি,–নবদম্পতি। দেখে মনেও হয় না এইপবিত্র স্থানের তিন মাইলের মধ্যে মানুষ মানুষকে অকারণে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে বিষবাষ্প দিয়ে, বোমা দিয়ে, কলের কামান দিয়ে। যুদ্ধ বর্বরের ব্যবসায়। অথচ এই হাসি, এই আনন্দ, তরুণ দম্পতির কত আশা, উৎসাহ।

এ্যালিস ঠিকই বলেছে। সব যাবে–কাল সকালেই হয়তো যাবে, জাপানি বোমায়। পবিত্র ফা-চীন মন্দির যাবে, পাইন গাছের সারি যাবে, লাল মাছ যাবে, এই তরুণ দম্পতি যাবে, সে যাবে, মিনি, এ্যালিস, সুরেশ্বর, বৃদ্ধ লি–সব যাবে। যুদ্ধ বর্বরের ব্যাবসায়।

ফুল ছড়ানো শেষ হয়েছে। মন্দিরের বাঁকানো ঢালু ছাদে পোষা পায়রার দল উড়ে এসে বসেছে। পাথরের সিঁড়ির ওপরের ধাপটা ফুলে ভরতি। নবদম্পতি তখন হাসছে–এ একটি ভারি অপ্রত্যাশিত আমোদের ব্যাপার হয়েছে তাদের কাছে। ওদের হাসি ও আনন্দ যেন দানবীয় শক্তির ওপর,–মৃত্যুর ওপর,–মানুষের জয়লাভ। মহাচীনের নবজন্ম হয়েছে এই তরুণ-তরুণীতে। স্বর্গ থেকে ফা-চীন-এর পবিত্র অমর আত্মা ওদের আশীর্বাদ করুন।

এ্যালিস এসে বিমলের হাত ধরল।

চলো যাই বিমল। হাসপাতালে ডিউটি রয়েছে–তোমার আমার এক্ষুনি–